ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ১২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ পৌষ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ৫ সফর, ১৪৩২ হিজরি | ৩১ ফাতাহ্, ১৩৯০ হি. শা. | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১ ঈসাব্দ

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.

Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon Since 1985

www.amecon-bd.net

Our Activities

- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mPxc Î

'কুরআনকে যারা সম্মান দান করবে, আকাশে তারা সম্মান লাভ করবে'
'সমস্ত ঘরবাড়ি যদি ধ্বংস হয়, হতে দাও তবুও নামায পরিত্যাগ করো না'

গভীর মনোনিবেশের সাথে পবিত্র কুরআন পাঠ করার গুরুত্ব সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন –

তোমরা বিশেষ মনোনিবেশের সাথে কুরআন শরীফ পাঠ কর এবং এর সাথে প্রগাঢ় ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এমনই গভীর ভালবাসা যা অন্য কারও সাথে তোমরা কর নাই।

কুরআন শরীফ সার্বিক সফলতা ও মুক্তির উৎস। ধর্ম-সম্বন্ধীয় তোমাদের এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নেই, কুরআন শরীফে যা পাওয়া যায় না। কিয়ামত দিবসে কুরআন শরীফই হবে তোমাদের ঈমানের সত্যাসত্যের মানদন্ড। কুরআন শরীফ ছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, কুরআন শরীফের সাহায্য না নিয়ে যা তোমাদের 'হেদায়াত' দান করতে পারে। [রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃষ্ঠা-২৬]

কুরআন করীমের কল্যাণ ও আশিস সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অবিস্মরণীয় এক বাণী হলো–তোমাদের জন্য একটি জরুরী শিক্ষা এই যে, কুরআন শরীফকে অকেজো বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করো না কারণ এতে তোমাদের জীবন নিহিত। কুরআনকে যারা সম্মান দান করবে, আকাশে তারা সম্মান লাভ করবে। [রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, কিশতিয়ে নূহ্, পৃষ্ঠা-১৩]

তিনি (আ.) আরও বলেন– "অতএব তোমরা গভীর অভিনিবেশ সহকারে পবিত্র কুরআন পাঠ কর আর এরই সাথে গভীর প্রেমময় সম্পর্ক গড়ো।" [রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, কিশতিয়ে নূহ্, পৃষ্ঠা-২৬]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলছেন 'হে যারা ঈমান এনেছ! নিজেকে আর নিজ পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো'। (সূরা আত্‌তাহরীম:৭) 'আর তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে নামাযের জন্য তাগিদ করতে থাকো'। (তোহা:১৩৩)

নামায প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়আত গ্রহণের তৃতীয় শর্তে সবাই নিম্নরূপে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছেন-*বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)- এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যনুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যেহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হামদ ও তা'রীফ (প্রশংসা) করিবে।*

হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) তাঁর অমূল্য উপদেশ বাণীতে বলেছেন-
"সমস্ত ঘরবাড়ি যদি ধ্বংস হয়,হতে দাও তবুও নামায পরিত্যাগ করো না।"

সমগ্র বিশ্ব আজ অবক্ষয়ের অতল গহবরে নিমজ্জিত। দিনে দিনে পৃথিবী ধ্বংসের পথে ধাবিত। চার দিক যেন অমানিশার ঘোর অন্ধকার। আজ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক মাত্র উপায় হচ্ছে প্রতিটি ঘরে নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করে এর প্রতি আমল করা। আমরা যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় জীবন পরিচালিত করি তাহলে মহান খোদা তাআলা অবশ্যই আমাদের ডাক শুনবেন। তাই আমাদের সবার উচিৎ নিষ্ঠার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা এবং গভীর মনোনিবেশের সাথে প্রত্যেহ কুরআন পাঠ করে এর উপর আমল করা। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন।

৩১ ডিসেম্বর ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
২৫ ডিসেম্বর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
হযরত আলী (রা.) মূল: ফজল আহমদ, ইউকে ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ	১০
প্রসঙ্গ : নামায ও দোয়া কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	১৩
স্মরণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সৈয়দ মমতাজ আহমদ	১৫
সত্যের বিজয় মাহমুদ আহমদ সুমন	১৯
সত্যিকার দাবীকারকের মাপকাঠি মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২১
প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সত্যতায় হাজারো নিদর্শন মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু	২৩
বাংলার কিংবদন্তি জার্মানীর প্রথম মিশনারী খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী	২৫
পাঠক কলাম	২৭
সংবাদ	২৯
ক্রোড়পত্র	৩০
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩১
এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানসূচী	৩২

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٥﴾

৯৫। আর কাফেলাটি যখন যাত্রা করলো (তখন) তাদের পিতা বললো, 'আমার মতিভ্রম ঘটেছে বলে তোমরা যতই মনে কর না কেন আমি কিন্তু নিশ্চয়ই ইউসুফের সুগন্ধ পাচ্ছি'[১৪০৮]।

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٦﴾

৯৬। তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি নিশ্চয় তোমার সেই পুরাতন ভ্রমের মাঝেই রয়ে গেলে।'

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭। এরপর সুসংবাদাতা যখন এসে পৌঁছলো (এবং) সে তার (অর্থাৎ ইয়াকুবের) সামনে সেই (জামাটি) রেখে দিল তখন সে সবকিছু বুঝতে[১৪০৯] পারলো। সে বলল, 'আমি কি তোমাদের বলিনি, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে জ্ঞান রাখি তোমরা সেই জ্ঞান রাখ না?'

১৪০৮। তাদের দল (ইউসুফের ভাইয়েরা) বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর লোকজনের কাছে বলেছিলেন, সকল প্রতিকুল অবস্থা সত্ত্বেও তাঁর আশা, তিনি শীঘ্রই ইউসুফ (আ.) এর দেখা পাবেন। তাঁর এই নিশ্চিত ধারণাকে জোর দিয়ে ব্যক্ত করবার জন্য তিনি বলেছিলেন, তোমরা যাতে বলতে না পার যে আমার মতিভ্রম ঘটেছে, (সেজন্য আমি বলবো) নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

১৪০৯। আল্লাহ্ তাআলা থেকে প্রাপ্ত ইলহামের ভিত্তিতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবিত থাকার ব্যাপারে যে বিশ্বাস এবং প্রত্যয় হযরত ইয়াকুব (আ.) এর মনে ছিল তা এখন তাঁর নিকট তথ্যপূর্ণ জ্ঞানে পরিণত হলো যখন তাঁর সামনে ইউসুফের (আ.) জামা এনে রাখা হলো। *ফারতাদ্দা বাসীরান* অর্থাৎ তিনি পূর্ণ জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। হযরত ইয়াকুব (আ.) অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কুরআন এই কথা সমর্থন করে না। এই ধারণা আল্লাহ্ তাআলার এক নবীর মর্যাদার সাথে শুধু অসমাঞ্জস্যপূর্ণই নয়, বরং কুরআনের বহু আয়াত এই কথা অস্বীকার করে। মনে হয়, এটাই ছিল সেই জামা যা ইউসুফ (আ.)-কে কূপে ফেলে দেয়ার সময় তাঁর পরিধানে ছিল।

হাদীস শরীফ

কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য শাফাআত করবে

❑ **কুরআন :**

আকিমিস্ সালাতা লিদুলুকিশ্ শামসি ইলা গাসাকিল লায়লি ওয়া কুরআনাল ফাজরে, ইন্না কুরআনাল ফাজরে কানা মাশহুদা (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৯)।

অর্থাৎ–তুমি সূর্য ঢলে যাবার পর হ'তে রাতের ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পড়াকে গুরুত্ব দাও, নিশ্চয় প্রভাতে কুরআন পাঠ এমন (একটি বিষয়) যে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়।

❑ **হাদীস :**

আন আবি উমামাতা ক্বালা সামি'তু রসূলুল্লাহে ইয়াকুলু ইকরাউল কুরআনা ফাইন্নাহু ইয়া'তি ইয়াওমাল কিয়ামাতি শাফিআন লিআসহাবিহি।

অর্থাৎ হযরত আবূ উমামা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি : "তোমরা কুরআন পড়ো। কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য শাফাআত করবে (মুসলিম)।"

> **"তোমরা কুরআন পড়ো। কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য শাফাআত করবে (মুসলিম)।"**

❑ **ব্যাখ্যা :**

পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শক। এর মধ্যে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান বিদ্যমান। এমন এক পরিপূর্ণ কিতাব যার মাঝে আধ্যাত্মিক ব্যাধি হ'তে মুক্তিদানকারী ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। কিন্তু পরিতাপ ঐ জাতি যাদেরেকে এ মহান গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তারা এথেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর তাই এ **খায়রে উম্মত** আজ অধ:পতনের অথৈ গহ্বরে পতিত। নামাযের সাথে পবিত্র কুরআনের সম্পর্ক রয়েছে। খোদার নৈকট্যের একমাত্র সহজ উপায় হলো নামায। এ নামাযের মধ্যে খোদার বাণী যেভাবে ভক্তি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়া যায় অন্য সময় তা সম্ভব নয়।

কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা প্রভাতের তেলাওয়াতের মহিমা বর্ণনা করেছেন। এর দু'টি অর্থ হ'তে পারে। প্রথমত: তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ আর দ্বিতীয়ত: ফজরের নামায আদায়ের পর কুরআন পাঠ। এরূপ কর্ম খোদার নিকট খুবই প্রিয়। যে ব্যক্তি খোদার স্মরণে তার প্রতিদিনের কর্ম সূচনা করে দিনের বাকী অংশটুকু তার উত্তমভাবে কাটানোটাই স্বাভাবিক।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, কুরআন পাঠ কারীর জন্য কিয়ামতের দিন কুরআন শাফাআতকারী হবে। এ হ'তে বুঝা যায় কুরআন পাঠের গুরুত্ব কত বড়। আজ আমরা যারা আখারীনদের দলভুক্ত তাদের উপর কুরআন প্রচারের মহান দায়িত্ব। এ উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য আমাদের সকলকে কুরআন তেলাওয়াতের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এর শিক্ষার উপর আমল করতে হবে। সঠিকভাবে নাযেরা পড়া শিখতে হবে। তারপর অর্থ শিখতে হবে। প্রতিদিন সকালে কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হ'তে হবে। প্রতিটি আহমদী বাড়ী হ'তে প্রভাতকালে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ধ্বনি শুনা যেতে হবে। তবেই আমরা কুরআন প্রচারে সফলতা লাভ করব। ইসলাম ও হযরত নবী করীম (সা.) কুরআনেরই অপর নাম। তাই কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কুরআন পাঠ না করলে উপরোক্ত দু'টি বিষয়ই অজানা হয়ে যাবে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) বলেছেন, যে কুরআনকে ইজ্জত দিবে আকাশে তাকে ইজ্জত দেয়া হবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর কালাম পড়ার ও বুঝার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

অমৃতবাণী

প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং হিসাব-নিকাশ দিবসকে স্মরণ রেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত। সে মুহূর্তকে ভয় করা উচিত যখন পাপাচারীদের আক্ষেপ চরম পর্যায়ে পৌঁছুবে আর সীমালঙ্ঘনকারীদের চেহারা সুস্পষ্টভাবে দেখানো হবে। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি, শায়খাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর) এবং তৃতীয় জন অর্থাৎ হযরত যুন্নুরাঈন [অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা.)]-কে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর অগ্রসেনানী হবার সম্মানে ভূষিত করেছেন।

সুতরাং যে তাঁদের পদমর্যাদাকে অস্বীকার করে, তাঁদের সত্যতাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে এবং তাঁদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করে না বরং তাদেরকে অপমান ও গালমন্দ করতে উদ্যত হয় এবং তাঁদের ওপর নোংরা আক্রমণ করে আমি এমন ব্যক্তির অশুভ পরিণাম ও ঈমান নষ্ট হবার আশংকা করি। যারা তাদের কষ্ট দেয়, অভিসম্পাত বর্ষণ করে, ও তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে–পরিণতিতে এমন লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং তারা পরম করুণাময়ের ক্রোধভাজন হয়। এটি আমার বারবারের অভিজ্ঞতা এবং একথা আমি স্পষ্টভাবে বলেছি যে, এসব নেতৃবর্গের প্রতি শত্রুতা, সব কল্যাণের উৎস আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার সবচেয়ে বড় কারণ। যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এমন মানুষের জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তার জন্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা তাকে ইহজগতের মোহে ও ইহজাগতিক কামনা-বাসনার অধীনস্ত করে দেন এবং সে অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ভয়াবহ খাদ ও গহ্বরে পতিত হয় যা তাকে গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করে, ফলে তার বোধবুদ্ধি লোপ পায়। তাঁদেরকে (অর্থাৎ প্রথম তিন খলীফাকে-অনুবাদক) নবীদের ন্যায় কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং রাসূলদের মত অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা যে রাসূলদের উত্তরাধিকারী তা সাব্যস্ত হলো এবং যুগে যুগে আগত ইমামদের ন্যায় বিচার দিবসে তাঁদের পুরস্কারও অবধারিত হয়ে গেল। কেননা **যদি কোন মু'মিনকে বিনা দোষে অভিসম্পাত করা হয়, কাফের আখ্যা দেয়া হয়, নোংরা নামে ডাকা হয় এবং অকারণে গালি দেয়া হয় তাহলে এমন মানুষ নবী ও মনোনীতদের সদৃশ হয়ে যান। তাঁকে নবীদের মত পুরস্কৃত করা হবে এবং তিনি রাসূলদের মতই পুরস্কার পাবেন।** সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা যে এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্মান ও মহিমার অধিকারী খোদার প্রশংসানুসারে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন এবং সব মনোনীত লোকের ন্যায় তাঁদেরকেও তিনি তাঁর ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

[সির্‌রুল খিলাফাহ্ (বাংলা সংস্করণ)
২০-২১ পৃঃ থেকে উদ্ধৃত]

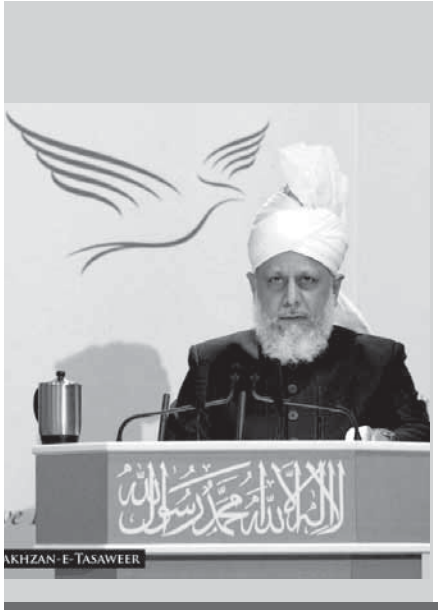

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যেরবাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৫ নভেম্বর ২০১১-এর (২৫ নবুয়ত, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

(বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে)

আজকাল আফ্রিকা মহাদেশের কোন কোন দেশের গোল্ডেন জুবলী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ সব অনুষ্ঠানাদির মাঝে আমাদের প্যান আফ্রিকান এসোসিয়েশন'ও অংশ গ্রহণ করছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে এ এসোসিয়েশন গঠন করা হয়েছিল, যা আফ্রিকান আহমদী বন্ধুদের সমন্বয়ে গঠিত।

যা হোক, আমি যেমন বলেছি, আমাদের এই এসোসিয়েশনও আফ্রিকান দেশগুলোর আনন্দে শামিল হচ্ছে। তারা এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান করবে, আমাকেও এতে অংশ গ্রহনের আমন্ত্রন জানিয়েছে; আমিও তাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব। কিন্তু আজ আমি স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলতে চাই। দাসত্ব থেকে মুক্তিএবং ধর্মীয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক বড় আর্শিবাদ। আফ্রিকা এমন একটি মহাদেশ যার অধিকাংশ দেশ সুদীর্ঘকাল পরাধীন জাতি হিসেবে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তাই এসব দেশের স্বাধীনতা দিবসের আনন্দোৎসব এবং জুবলী উদযাপন নিশ্চয় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটা তাদের প্রাপ্য অধিকার। আল্লাহ্ করুন আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে যেসব দেশ এই স্বাধীনতা অর্জন করেছে- এ স্বাধীনতা তাদের জন্য প্রকৃত অর্থেই যেন স্বাধীনতা প্রমাণিত হয়, এটিই আল্লাহ্‌র কাছে আমার আকুতি।পুনরায় যেন দাসত্বের জীবনে তাদের ফিরে যেতে না হয়। বরং এরা যদি সৎ উদ্দেশ্যে, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে নিজেদের স্বাধীনতাকে কাজে লাগায় তাহলে এটি অসম্ভবনয় যে, আফ্রিকা মহাদেশ অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবে। ধর্মের ইতিহাসে দৃষ্টিপাতে আমরা জানতে পারি যে সম্মানিত নবীগণ আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে পৃথিবীতেযেসব কাজের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন তার মধ্যে একটি অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণকাজ হলো স্বাধীনতা। তা সে অত্যাচারী শাসক এবং ফেরাউনদের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা অথবা ধর্ম বিকৃত হওয়ার কারণে, অথবা ধর্মের নামে ধর্ম ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে যে সকল কুপ্রথা অথবা ধর্মীয় রীতি-নীতির বা আচার-অনুষ্ঠানের বেড়ি গলায় পরিয়েছেন- তার দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা প্রদান। এক কথায় সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তি সম্মানিত নবীদের সাহায্যে অর্জিত হয়ে থাকে। কিন্তুএটি বড়ই পরিতাপের বিষয় যে অনেক জাতি এই সত্যকে বুঝেনি এবং স্বাধীনতারপ্রকৃত পতাকাবাহীদের অস্বীকার করে, কেবল নিজেরাই প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়নি বরং আল্লাহ্‌র আযাবগ্রস্ত হয়ে ধ্বংশ হয়েছে। তারা সর্বোত্তম শাসকের (আল্লাহ্‌র) শাসনের উপর জাগতিক শাসকদের দাসত্ব করাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। সেই (খোদার) দাসত্বের উপর একে প্রাধন্য দিয়েছে যে দাসত্ব বরণের ফলে স্বাধীনতার নতুনধারার সূচনা হয়েছে।

সুতরাং স্বাধীনতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ার কারণে কেবল স্বাধীনতাই হাতছাড়া হয়নি বরং (মানুষের) ইহ ও পরকালও ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব যদি প্রকৃত স্বাধীনতারমর্মোদ্ধার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে আসল স্বাধীনতা সম্মানিত নবীদের মাধ্যমে লাভ হয়। আমাদের সামনে স্বাধীনতার সবচেয়ে উজ্জল সূর্য্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা(সা.), যাঁর কিরণ দূর-দূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করেছে, যিনি নিজের মাঝে সকল প্রকারস্বাধীনতাকে ধারণ করে রেখেছেন। যিনি মানুষকে শুধু বাহ্যিক দাসত্ব থেকেই স্বাধীনতাদেননি, বরং বিভিন্ন প্রকার বেড়ি যা মানুষ নিজের ঘাড়ে পরে রেখেছিল তা থেকেও তাদের মুক্ত করেছেন। হুযূর (সা.)-এর সাথে প্রকৃত অর্থে সম্পৃক্ত থাকলে আজও তাঁরসত্বা স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু তাঁকে খাতামান্ নাবীয়ীন উপাধিতে ভূষিত করলেন- তাই তাঁর 'খাতামিয়ত বা খাতামান নবীঈন হওয়াসমস্তজাগতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাকে আয়ত্বে এনে তাতে মোহরাঙ্কিত করেছে। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই আর আল্লাহ্‌তা'লার সাক্ষ্য প্রদান ও ঘোষণার পর কোন পবিত্রচেতা ব্যক্তির মনে এ সন্দেহই থাকতে পারেনা যে, মুহাম্মদী মোহরই সকল ধরণের উৎকর্ষতাকে সত্যায়িত করতে পারে আর এ সকল উৎকর্ষতার পরম বিকাশ তাঁর স্বত্ত্বাতেই ঘটেছে। প্রত্যেক কাজ এবং বিষয়ের পরম অনুপম রূপ যেহেতু তিনি (সা.), তাই সকল প্রকার স্বাধীনতার পূর্ণ উৎকর্ষতা ও তাঁর স্বত্ত্বা হতে উৎসারিত হওয়ার কথা এবং হয়েছেও। বিশ্বের এক বিশাল জনগোষ্ঠি অবলোকন করেছে যে, এ

উৎকর্ষতাবড় মহিমার সাথে তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, আর যারা প্রকৃত পক্ষে এখন পর্যন্ত তাঁর সাথে সম্পৃক্ত তারাও এর পরিপূর্ণতা দেখছে বা দৃশ্য অবলোকন করছে। তাঁর প্রতিঅবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গীন গ্রন্থ যা 'খাতামাল কুতুব'ও আখ্যায়িত হয়েছে তাতে স্বাধীনতার বিষয়টিকে বিভিন্ন বরাতে এবং বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অধিকন্তু মহানবী (সা.) এর পবিত্র আদর্শ এ সুন্দর শিক্ষার সৌন্দর্যকে আরো বর্ধণ করেছে। আল্লাহ্‌তা'লাকুরআন করীমের এক স্থানে বলেন, 'ফাক্কু রাক্বাবাহ' (দাস মুক্ত করা) বা এভাবেও বলতে পারেন, দাস মুক্ত করা বা মুক্ত করতে সাহায্য করা। একটি আয়াতের অংশ বিশেষ উপস্থাপন করছি যাতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

(সূরা বাকারা ১৭৮) ''আর তারা তাঁরা ভালবাসায় আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থী এবং ঘাড় মুক্ত করা অর্থাৎদাসদের মুক্ত করার জন্য সম্পদ খরচ করে''।

ইতোপূর্বে যে বিষয় আলোচিত হচ্ছিল সেটিকে সম্মুখে রাখুন তা হলে দেখবেন এটি অনেক বড় পূন্য। আল্লাহ্ তা'লা, পরকাল, ফেরেশতা, ঐশী কিতাব এবং নবীদের উপর বিশ্বাস আনায়নের পর এ পূণ্যগুলোই বান্দাকে খোদার নৈকট্য দান করে, আর সেই সকল পূণ্যের মাঝে দাসদের মুক্ত করাও অর্ন্তভূক্ত। তাই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য, পূণ্যে অগ্রগামী হওয়ার জন্য দাস মুক্ত করা অনেক বড় একটি পূণ্য কর্ম।

হাদীস সমূহেও এ সম্পর্কে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত বুখারীর হাদীসে এসেছে- মহানবী (সা.) বলতেন, ''যে মুসলমান দাস মুক্তকরবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দোযখ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দান করবেন''। ইসলামে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ দাসমুক্ত করার শিক্ষা কুরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। কোথাও বলেছেন, যদি ভুলবশত: মু'মিন কর্তৃক কোন মু'মিন নিহত হয় তাহলে দাস মুক্ত কর আর রক্তপণও আদায় কর। কেবল মু'মিন হত্যার শাস্তি হিসেবেই দাস মুক্ত করার এ শাস্তি বা আদেশ দেয়া হয়নি বরং বলা হয়েছে, যদি কোন জাতির সাথে তোমাদের চুক্তি থাকে আর সেই জাতির কোন কাফের তোমাদের হাতে নিহত হয়, তাহলে বিনিময়ে একজন দাসকে মুক্ত কর। এছাড়া খোদার নামে কসম ভঙ্গের শাস্তি স্বরূপ যেখানে মানুষের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, যেমন, যদি এটি না হয় তা হলে এ শাস্তি পাবে বা ঐটি না করলে ঐ শাস্তি, এসব শাস্তির মাঝে দাস মুক্ত করাও একটি শাস্তি।

সুতরাং বিভিন্ন জায়গায় দাসমুক্ত করার যে উল্লেখ রয়েছে তার কারণ হলো, ইসলাম ধীরে ধীরে দাস প্রথাকে নির্মূল করতে চায়। দাস গ্রহণের সাধারণ যে প্রথা মহানবী (সা.) এর যুগে বা তাঁর পূর্বে ছিল ইসলাম এসে বিভিন্নভাবে এ প্রথাকে উচ্ছেদের উপর জোর দিয়েছে। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, বরং হযরত আবু বকরের কন্যা হযরত আসমা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে- হযরত নবী করীম (সা.) মুসলমানদের বলতেন, সূর্য গ্রহণের সময়ে কৃতদাস মুক্ত করো অর্থাৎ যার সামর্থ বা সুযোগ আছে সে যেন এমনটি করে।

দাসদের সম্মান এবং তাদের অধিকারের কথা তিনি (সা.) নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখকরেছেন- এক পরিবারে সাত ভাই ছিলো আর তাদের কাছে এক পৌত্তলিক কৃতদাস ছিলো। কোন কারণে কৃতদাসের উপর এক ভাইয়ের রাগ ধরে, রাগের বশবর্তি হয়ে সে দাসকে সজোরে থাপ্পড় মারে বা চপেটাঘাত করে। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর কানে যখন এই কথা আসে তিনি (সা.) বললেন এই দাসকে মুক্ত করে দাও। এই কৃতদাসকে রাখার তোমাদের কোন অধিকার নেই, কেননা তোমরা কৃতদাসের প্রতি উত্তম আচরণ করতে জান না।

বস্তুত: আমরা যদি সেই যুগে ফিরে যাই যখন কৃতদাস রাখা একটি সাধারণ নিয়ম ছিলো আর যারা সমাজের প্রধান ছিল তাদের জন্য এটি অনেক বড় সম্পদ গণ্য হতো। সে সময় যার কাছে যত বেশি দাস থাকতো তাকে ততোটা সম্পদশালী বলে মনে করা হতো। প্রভাবশালীরাই কৃতদাস রাখতো। সেই সময় এই আদেশ দেয়া হয় যে, যদি প্রকৃত সম্পদ চাও যা ঈমানের সম্পদ, তাহলে কৃতদাসদের মুক্ত করো। তাদের মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি কর। আর এই আদেশের কারণে সাধ্যানুসারে কয়েক ডজন থেকে কয়েক হাজার কৃতদাসদের তাঁরা মুক্তি দিয়েছেন।

হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) সম্পর্কে বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি এক সুযোগেই বিশ হাজার কৃতদাসকে মুক্ত করে দেন। এছাড়া অন্য সময়েও তিনি আরো বেশ কয়েক হাজার কৃতদাসকে মুক্ত করেছেন। অনেকেই কয়েক ডজন করে মুক্ত করেছেন অর্থাৎ যার যতটুকু সুযোগ হয়েছে তা কাজে লাগিয়েছেন। যাদের কাছে কাজ-কর্মের জন্য কৃতদাস ছিলো তাদের জন্যও ইসলামের এই শিক্ষাই ছিলো যে, তাদের সাথে নিজ ভাইয়ের ন্যায় আচরণ করো। যা নিজে পরিধান করবে তাদেরও তা পরিধান করাও, নিজে যা খাও তাদেরও তা-ই খেতে দাও।

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ব্যক্তিগত আদর্শ হলো, বিবাহের পর যখন হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর (রা.) সমস্ত কৃতদাস ও সম্পদ তাঁর (সা.)- এর হাতে ন্যস্ত করেন তিনি (সা.) সবাইকে মুক্ত করে দেন। তাদের মধ্যে থেকে যায়েদ বিন হারেস নামে এক দাস ছিলো যাকে তিনি (সা.) পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন আর তার সাথে এমন স্নেহ এবং ভালোবাসার ব্যবহার করতেন যে, যখন তার প্রকৃত পিতা-মাতা তাকে নিতে আসে, হযরত যায়েদ (রা.) তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

অতএব, এ হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তম ব্যবহার। এই হলো উত্তম আদর্শ ও অনুগ্রহের পরম বহিঃপ্রকাশ যার মাধ্যমে স্বাধীনতার উপর দাসত্বকে প্রাধান্য দেয়া হলো। যে কারণে তাঁর ভালোবাসার মোকাবালায় রক্ত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা তুচ্ছ প্রমাণিত হলো।

অতএব, ইসলাম এবং হযরত রসূল (সা.)- এর বিরুদ্ধবাদীদের কেউ দাস বা মানবতার মুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর (সা.) অবদানের সমতূল্য এরূপ একটি দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করতে পারবে? তিনি (সা.) তাঁর নিজের অনুসারীদেরকে বলেছেন, দাসদের দিয়ে কাজ করানোর সময় তাদের সাথে স্নেহসূলভ আচরণ করো। আর যদি কোন কঠোর পরিশ্রমের কাজ হয় তাহলে সে কাজে তাদের সাহায্য কর। আর এভাবে তিনি (সা.) দাস প্রথার ধারণা বদলে দিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে এক ইতালিয় ধর্মযাজক ডাক্তার ওয়েগলেরী লিখেন, যখন থেকে মানব সমাজের উন্মেষ ঘটেছে তখন থেকে আজ পর্যন্তমানব সমাজের এর (দাস প্রথার) প্রচলন রয়েছে। একজন মুসলমান যাযাবর হোক বা সভ্য তার কাছে কৃতদাসের অবস্থান অন্যদের তুলনায় অনেক উন্নত। আমেরিকায় আজ থেকে একশ বছর পূর্বে বিরাজমান দাসপ্রথার সাথে প্রাচের দেশসমূহের দাস প্রথারতুলনা করা অন্যায় হবে। মহানবী

(সা.)-এর হাদীসে দাসদের প্রতি গভীর সহানুভূতিদেখা যায়। তিনি (সা.) এ কথা বলতেন, ''এটি কখনো বলো না যে, সে আমার দাস বরং বলো সে আমার ছেলে। আর এটি বলো না যে সে আমার দাসী বরং বলো সে আমার কন্যা''। তিনি আরও লেখেন যে, যদি ইতিহাসের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, হযরত রসূল (সা.) এই বিষয়ে কত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেছেন।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এক স্বাধীন ব্যক্তির ঋণ নিয়ে ঋণ শোধে অপারগতার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিত। কোন ব্যক্তি কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহন করে ফেরত না দেয়া পর্যন্ত ঋণদাতার দাসত্ব করতে হতো বা এ ধরণের আশঙ্কা থাকতো। তিনি লিখেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে দাস বানাতে পারতো না। খোদার নবী (সা.) দাস প্রথাকে কেবল সীমিতই করেননি বরং তিনি এ ব্যপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন এবং মুসলমানদের বলেছেন তারা যেন সকল কৃতদাস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

প্রফেসর ওয়েগলেরী সাহেব ইতালীয় ভাষায় লিখেছেন, এই বই ইংরেজীতে অনুবাদকরা হয়েছে এবং জামাত আহমদীয়া আমেরিকা কোন এক সময় এটি প্রকাশওকরেছিল। এতে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে বেশ ভাল বক্তব্য রয়েছে। এটি পুনরায় প্রকাশকরা উচিত। কারো নামে যদি স্বত্ত্ব সংরক্ষিত (কপি রাইটস) না থাকে আর আমেরিকানরা অনুমতি পেয়ে থাকে তাহলে তা পুণরায় প্রকাশ করা উচিত। এটি সেই সমস্ত শত্রুদের মুখ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট যারা ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর বিরোধীতা করে।

সুতরাং এটি সেই শিক্ষা ও সেই আদর্শ যার গুরুত্ব স্বীকার না করে তিনি পারেননি। এটি সেই মহান শিক্ষা ও আদর্শ যা মানুষের মুক্তির প্রকৃত তত্ত্ব ও অর্থ বহন করে। আমি এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ তুলে ধরেছি। কুরআন ও হাদীসে আমরা এ ব্যপারে অগনিত আদেশ নিষেধ ও দিক নির্দেশনা দেখতে পাই। আর এটিই সেই মৌলিক শিক্ষা যা পালন করে পৃথিবীবাসী মুক্তি পেতে পারে, আর শান্তি, ন্যায়বিচার ও সৌহার্দ্যপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আফ্রিকায় যারা স্বাধীনতা পেয়েছেন অর্থাৎ সেখানে যারা আহমদী হয়েছেন তাদের কাজ হলো, এই শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়া এবং অধিক থেকে অধিকতর জনগোষ্ঠীকে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের গন্ডির্ভূক্ত করা যেন তারা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে। শুধু একবার গোল্ডেন জুবিলী উদ্‌যাপন করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং স্বাধীনতা তখন প্রতিষ্ঠিত হবে যখন শাসকরা এবং জনসাধারণ উভয়ে এটি বুঝবে যে, আমাদের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করা যায় আর এর জন্য কী পথ বা পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। সেই পথ বা পদ্ধতি কেবল মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ও কুরআনী শিক্ষার মাঝেই পাওয়া যাবে। ওয়েগলেরী সাহেব তো কেবল এতটুকু লিখেছেন যে, কোন মুসলমানকে দাসত্বের গন্ডিভূক্ত করা যাবে না কিন্তুপ্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজে কখনও কেউ দাস হতে পারে না। এ কথাটিও একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মহানবী (সা.) মৃত্যুরপূর্ব মুহূর্তে উম্মতকে যে অন্তিম উপদেশ দিয়েছিলেন তা ছিল, ''নামায এবং দাস সম্পর্কীত আমার শিক্ষাকে তোমরা ভুলবে না''। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান বিশেষভাবে সম্পদশালী ও ক্ষমতাসীনদের এটি দূর্ভাগ্য যে তারা এই দু'টি শিক্ষাকেই ভুলে গেছে। তাদের নামাযেও সেই স্বাদ ও উৎসাহ উদ্দীপনা এবং খোদাভীতি দেখা যায় না এবং দাস প্রথা দূরীভুত করার কোন প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয় না। যদিও দাস কেনা বেচার সেই চিত্র এখন বিদ্যমান নেই, কিন্তু ক্ষমতার নামে জনসাধারণের সাথে দাসের ন্যায় আচরণ করা হয়। কিছু দেশে বিশেষভাবে আরব দেশসমূহে যে অস্থিরতা ও শোরগোল দেখা যায় এর প্রধান কারণ হলো, জনগণের মাঝে এই বোধোদয় হয়েছে, আমাদের সাথে দাসের ন্যায় আচরন করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের নামে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু যিনি রাষ্ট্র প্রধান নিযুক্ত হন তিনি আজীবন ক্ষমতা আকড়ে ধরে রাখতে চান এবং চান যে তার পর তার সন্তানরাই ক্ষমতা ভোগ করুক। তোশামদকারী ও সুবিধাবাদীরা এসকল রাষ্ট্রপ্রধানদের আশে পাশে একত্র হয়ে তাদের ভালমন্দের পার্থক্য-শক্তি ও মূল্যবোধ একেবারে পাল্টে দিয়েছে। তার ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার সকল সম্ভাব্য চেষ্টা তারা করে থাকে। নিজেদের প্রজাদের উপর গুলি বর্ষণ করে। অত:পর জনসাধারনের পক্ষ থেকে দেশের শাসকের নির্যাতন থেকে মুক্তির নামে যে সকল নৈরাজ্য মাথা চাড়া দেয়, ইসলামের শত্রু-শক্তি বা পরাশক্তি অথবা সুযোগ সন্ধানী শক্তি স্বীয় স্বার্থ্যে দেশের ধন-সম্পদ করায়ত্ব করার মানসে আরো উস্কানিমূলক পদক্ষেপ নেয়। সাহায্যের নামে আসে এবং এরপর এরূপ এক দুষ্ট বলয়ের সূচনা হয় যা দেশের উন্নয়নকে শত বছর পশ্চাতে নিয়ে যায়। জনসাধারনের স্বাধীনতার সংগ্রামকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে। তারা স্বজাতির দাসত্ব থেকে বেরিয়ে বিদেশীদের দাসত্বে চলে যায়। যদি সরাসরি নাও হয় পরোক্ষভাবে তা হয়। আমি প্রথমেও বলেছি কতিপয় শক্তিশালী সরকার যে সকল সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতা করে তাদেরকে বছরের পর বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখে এবং জনসাধারনের স্বাধীনতা হরনের কোন তোয়াক্কা করে না; যখন তাদের স্বার্থচরিতার্থ হয় না তখন তারা জনসাধারনের স্বাধীনতার নামে দেশে অভ্যুত্থান ঘটায়। তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বর্তমান চিত্র হলো কতিপয় দেশে অতি সম্প্রতি শাসক পরিবর্তিত হয়ে নতুন শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদেরকে দেখে এই পরাশক্তিরা দু:শ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে যে, আমাদের পছন্দসই শাসক ক্ষমতায় সমাসীন হয়নি। কতিপয় স্থানে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক পরিবর্তন আসেনি বা এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন আসবে না। তাই এ বিষয়গুলো তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে আর একটি বিশৃঙ্খলা ও কপটতার ধারা সূচিত হতে যাচ্ছে, বরং অনেক স্থানে আরম্ভ হয়ে গেছে। জনসাধারণও ভুল ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত এক শাসকের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অন্য শাসকের পরাধীনতায় নিমজ্জিত হচ্ছে, আর কোন কোন স্থানে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। এখন তারা এটা অনুভব করতে পেরেছে যে, দেশের সম্পদ এখনো জনসাধারণের স্বার্থে, তাদের কল্যাণের জন্য, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে আর না ভবিষ্যতে করা হবে। কেননা যে শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে তারাও নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার ধ্যান ধারণা নিয়ে ক্ষমতা দখল করছে। দারিদ্র ও বঞ্চিত জনসাধারণ পূর্বেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ভবিষ্যতে তা দূর হবে বলে যে আত্মপ্রসাদ নেয়া হচ্ছে তা ঠিক নয়, তা দূরীভূত হবে না বরং অবশ্যই বিরাজমান থাকবে। এরূপ অবস্থা কিছুদিন পরে আপন-ারা স্বয়ং দেখতে পাবেন। কেননা শাসকরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশমেনে চলেনি। মুসলমান বলে দাবী করে কিন্তু তাঁর নির্দেশ মান্যকারী নয়। অতীতে ধন-সম্পদের বলে মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করত;

এখন দেশের সম্পদ দেশের জনসাধারণকেই দাসে পরিণত করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন প্রচার মাধ্যমও এসম্পর্কে মুখ খোলা আরম্ভ করেছে, ছবিও প্রকাশিত হচ্ছে যে, তেল সমৃদ্ধ দেশসমূহেও দরিদ্রতা ছেয়ে আছে। একদিকে স্বর্ণের রাজপ্রাসাদ অপরদিকে কোন কোন পরিবারের দুই বেলা পেট ভরে খাবার জোটে না।

সুতরাং অধিকার খর্ব করে জনসাধারণকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা হচ্ছে এবং হয়েছে। কোথায় সেই যুগ, যখন হযরত ওমর (রা.)-কে শত্রুদের শক্তি অর্জনের কারণে নিজের সৈন্য বাহিনীকে খৃষ্টান অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য সেই অঞ্চল সমূহে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব ছিলনা। কিন্তু মুসলমানগণ খৃষ্টানদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে টাকা কর হিসেবে নিয়ে ছিল তা এই বলে ফেরত দেয় যে এখন যেহেতু আমরা তোমাদের অধিকার প্রদানে অপারগ তাই তোমাদের নিকট থেকে যে অর্থ নিয়েছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি। সেই সময়কার খৃষ্টান প্রজার কেঁদে কেঁদে এই দোয়া করে যে, আমরা দোয়া করি তোমরা ফিরে আস। কেননা আমরা তোমাদের মত শাসক দেখিনি। মুসলমানদের শাসনের অধীনে আমরা যে ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি তা আমরা আমাদের শাসকদের নিকট থেকেও পাইনি। কোথায় সে যুগ! আর এ যুগে, মুসলমানশাসকগণ মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করছে এবং দেশে ন্যায়পরায়নতা নি:শ্বেষ হয়ে গেছে, অধিকার হরণ করা হচ্ছে। কারো ধন ও প্রাণ নিরাপদ নয়। অথচ ধৃষ্টতার সাথে এ দাবী করা হয় যে, জনসাধারণের জন্য তারা যা করছে তা আর কেউ করতে পারবে না। বিভিন্ন দেশে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে, সুযোগ সন্ধানীরা তা লুফে নিচ্ছে।অনেকে ধর্মের দোহাই দিয়ে স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করে চলেছে। এমনটি কখনো হতো না যদি জনগনকে তাদের অধিকার প্রদানকরা হতো। যদি সরকার ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো জনগণের স্বাধীনতারনিশ্চয়তা দিত সরকার যদি লোভ-লালসার পরিবর্তে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করতো তবে কখনো এ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো না। যাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি অর্থাৎধর্মীয় আলেমরা জনগনের ধর্মীয় জ্ঞান না থাকার কারণে ধর্মের মাঝে বিদাত বা ভুলপদ্ধতি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, ভুল ব্যাখ্যা করে তাদের ঘাড়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। ঐসব ভ্রান্ত রীতি-নীতি এবং ভুল শিক্ষা তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছে। মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে আগমনকারী মহান নবী (সা.) সর্ম্পকে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন

وَيَضَعُ عَنْـــهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم

(সূরা আরাফ ১৫৮) অর্থাৎ আমাদের নবী তাদের বোঝা হালকা করে থাকেন এবং যে বেড়ি তাদের ঘাড়ে রয়েছে তা অপসারণ করেন। কিন্তু এখানে আজকাল কী হচ্ছে? আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। যেক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ অর্থাৎ অমুসলিম দেশ সমূহে জনগনের অধিকার, ন্যায় পরায়নতা এবং জনগনের স্বাধীনতা ও উন্নতি অবলোকন করে তাদের আদর্শ অনুকরণ করা উচিত ছিল সেখানে এদের অবস্থা এক্ষেত্রে একেবারেই এর বিপরীত। ঐ সব আলেম ওলামাদের উচিত ছিল প্রকৃত ইসলামের প্রসার করে সকল প্রকার বেদাত থেকে মুসলমানদেরকে পবিত্র করা অথচ তারাও তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে রেখেছে। উভয়েই সাধারন মুসলিম জনগনকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাই কেবল শাসকরাই দোষী নয় বরং এ সময়ের ওলামারাও তাদের দলের অন্তর্ভূক্ত যারা মিথ্যা রীতি-নীতি এবং মিথ্যা বিশ্বাসসমূহকে ধর্মের নাম দিয়ে জনসাধারণের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ছলে তাদেরকে এক অর্থে কৃতদাস বানিয়ে রেখেছে। আর এ ধারা অব্যাহত থাকবে, কখনো শেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা খোদা তা'লার প্রেরিত সেই ব্যক্তিকে মান্য না করবে যাকে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং আমাদেরকে সকল ধরনের বোঝা ও সকল প্রকারের বেড়ি থেকে পরিত্রাণ দেয়ার লক্ষ্যে প্রেরণ করেছেন। আর কেবল একটি দাসত্ব বরণের তিনি শিক্ষা দিয়েছেন তা হল খোদা তা'লা এবং তাঁর রসুল (সা.)-এর দাসত্ব যার মাধ্যমে স্বাধীনতার নব দিগন্ত উম্মোচিত হয়, সাম্য পরিলক্ষিত হয়, এমন এক চমৎকার সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে যেখানে অধিকার পাবার জন্য মিছিল করা হয় না, স্বাধীনতা লাভের জন্য অন্যায় পন্থা অবলম্বন করতে হয় না বরং অধিকার প্রদানের জন্য বাদশাহ এবং ফকির উভয়েই সচেষ্ট থাকে। অতএব এখন মুসলমানদের সম্মান রক্ষা এবং সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা থেকে পরিত্রাণের একটিই মাধ্যম, আর তা হল, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসুল (সা.)-এর আদেশাবলী এবং শিক্ষাসমূহ মেনে চলা। আর এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঐ ব্যক্তির অস্বীকার করা থেকে বিরত না হবে যাকে আল্লাহ্ তা'লা উভয় প্রকারেরঅধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে প্রেরণ করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতি চমৎকারভাবে আমাদের সামনে সেই শিক্ষাকে উপস্থাপন করেছেন যা সত্য ও সুবিচারপ্রতিষ্ঠিত রাখে, যা স্থায়ী স্বাধীনতার নিশ্চয়তা। তিনি (আ.) বলেনঃ''স্মরণ রেখো, একজন মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং বান্দার অধিকারসমূহ প্রদানের জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত থাকা উচিত। মৌখিকভাবে যেমন খোদা তা'লাকে তার স্বত্ত্বা এবং বৈশিষ্ট্যে এক অদ্বিতীয় মনে করা হয় ঠিক সেভাবেই কার্যে পরিণত করে তা দেখানো উচিত এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করা উচিত"। তিনি (আ.) বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বচ্ছ না হবে ততদিন পর্যন্তখোদা তা'লার সাথেও সম্পর্ক স্বচ্ছ হতে পারে না। যদিও এ দু ধরনের অধিকারের মধ্যে বড় অধিকার খোদা তা'লার কিন্তু তাঁর সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক এর জন্য আয়না-স্বরুপ। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে লেনদেনে স্বচ্ছ নয় সে খোদা তা'লার অধিকারও আদায় করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হচ্ছে কাউকে ভাই মনে করা। যে নিজেকে বড় মনে করে, অন্যদের তুচ্ছ মনে করে এবং তুচ্ছ প্রমাণের চেষ্টাও করতে থাকে, তার কাছ থেকে কখনো সুবিচার এবং ভ্রাতৃত্ব বোধের আশা করা যেতে পারে না। যাই হোক তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) যে জামাত গঠন করেছিলেন তাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকেই পূত, পবিত্র এবং প্রত্যেকে স্বীয় জীবনকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিলো। তাদের মধ্যে থেকে একজনও কপটতামূলক জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন না। সকলেই আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকার প্রদানকারী ছিল।

সুতরাং যখন ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়া হবে তখন সেই অবস্থার সৃষ্টি হবে যা বান্দাকে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায়কারী বানাবে এবং সৃষ্টিরঅধিকার আদায় করার ব্যাপারে মনোযোগ সৃষ্টি করবে। মুসলমানদের মাঝে, মুসলমানবিশ্বে আজকে আমাদের একজন নেতাও এমন চোখে পড়ে না যিনি এই মানে অধিষ্ঠিত। আর যখন প্রকৃত ন্যায় বিচার

এবং অধিকার প্রদানকারী নেই সেখানে প্রত্যেকেই নিজ অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য নিজের পদ্ধতি অবলম্বন করে। যেভাবে আমি বলেছি, এতে স্বার্থান্বেসীরা পুনরায় স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি করে। অত:পর ন্যায় বিচার এবং স্বাধীনতার নামে অত্যাচারের ও নিস্পেষনের এক নতুন উপাখ্যান ও নুতন কাহিনী আরম্ভ হয়ে যায়। সুতরাং বর্তমান স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে এক দাসত্ব থেকে বেড়িয়ে অন্য দাসত্বের গন্ডিতে প্রবেশের নাম। আফ্রিকার বেশীরভাগ দেশগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন অথবা অন্যান্য মুসলমান দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে এ দৃশ্যই দেখা যায়। অন্যদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও স্বজাতির নেতাদের চাপানো দাসত্ব তাদের পরিবেষ্টন করল।

মুসলমান দেশের নেতৃবর্গ, আফ্রিকান দেশের নেতৃত্ব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সেনা বাহিনী যারা প্রায়শই বিপ্লবের নামে ক্ষমতা করায়ত্ব করতে থাকে, ধর্মীয় নেত্রীবর্গ যারা ওলামা আখ্যায়িত হয় তারা সকলে যেন এ সত্যকে অনুধাবন করতে পারে যে, স্বজাতিকে দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ করলে, সুবিচার না করলে এবং অন্যান্যদের অধিকারসমূহ প্রদান না করে তারা আল্লাহ্ তা'লার হাতে ধরা পড়বে। প্রত্যেক শাসককে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি তোমাদের প্রজাদের অধিকার দিয়েছ? যা তোমাদের দায়িত্ব ছিল তা কি তোমরা পালন করেছ না কি দেশীয় সম্পদ নিজেদের স্বার্থে ব্যয় করেছ? ইসলাম এবং আল্লাহ্ রসূলের নাম তো নিয়েছো কিন্তু এই নামের প্রতি কি শ্রদ্ধাশীল ছিলে? না বোধক উত্তরের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার হাতে ধরা পড়বে কেননা খোদা তা'লার সামনে তো মিথ্যা বলা যেতে পারে না। খোদা তা'লার কাছে কোন বিষয় গোপন করা যায় না। আল্লাহ্ তা'লা কুরাআন করীমে বলেন,

অর্থাৎ প্রকৃত মুমিন তারা যারা তাদের আমানত এবং অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান। সুতরাং নেত্রীবর্গ তাদের উপর অর্পিত আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। কেননা তারা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষী রেখে অঙ্গিকার করেন। তারা এ অঙ্গীকার করেন যে, তারা দেশের কল্যাণ এবং সর্ব-সাধারনের কল্যাণ, তাদের অধিকার প্রদান, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতার জন্য সকল সম্ভাব্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু এটি চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় অধিকাংশ স্থানে জাতীয় সম্পদ লুটপাটের দৃশ্যই আমরা দেখতে পাই।

আলেমগন ধর্মকে জীবিকার উৎস হিসেবে নিয়েছে। আমি যেভাবে বলেছি জনসাধারনকে ভ্রান্ত প্রথা-প্রচলন, ভ্রান্ত শিক্ষা বিশ্বাসের বেড়ি পরিয়ে শুধু নিজেদের অনুগত রাখার চেষ্টা করা হয়। জনসাধারনও স্বীয় দায়িত্বে অবহেলা করছে। মোটকথা ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন না করে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তিকে আমন্ত্রন জানাচ্ছে। বর্তমান যুগেবিভিন্ন দেশে যেসব বিশৃঙ্খলা হচ্ছে তা এ বিষয়েরই আবশ্যকীয় ফলাফল। সন্ত্রাস, আর্থনৈতিক দুরবস্থা, অশান্তি ইত্যাদি শুধু বর্তমানের নয় বরং এক চরম অস্থিরভবিষ্যতের আভাষ দিচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ, পাকিস্তানেই স্বাধীনতার পর বাষট্টি-তেষট্টি বছরে এ বিষয়গুলো চরম রূপ ধারণ করেছে এবং প্রতিদিনই তা বেড়ে চলেছে। কেউ বলতে পারে না কাল কি হবে। তাই আমরা কীভাবে আশা করতে পারি যে ভবিষ্যত খুব ভাল হবে। ইংরেজদের দাসত্ব থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু স্বজনের দাসত্বের গলাবন্ধনী বা বেড়ি আরো শক্ত ভাবে চেপে বসেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দেশ ও জনগনের প্রতি করুণা করুন। যে পাকিস্তান অর্জনের সময় কায়েদে আযম ঘোষনা করেছিলেন, এখানে সব ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে সবাই সমান অধিকার পাবে সেখানে আহমদীদের সাথে কি আচরন করা হচ্ছে? প্রত্যেক আহমদী যেখানে সকল স্বাধীনতার উপর খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দাসত্বেথাকাকে প্রাধান্য দেয় এবং এজন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেনা, সেখানে আহমদীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়, আমরা তার (সা.) অবমাননাকারী (নাউযুবিল্লাহ্)। নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াকে আমরা কোন গুরুত্ব দেই না, বরং তুচ্ছ জ্ঞান করি। আমাদের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলেও আমরা তা সহ্য করে নেব এবং সহ্য করেও যাচ্ছি। কিন্তু এসব নামধারী আলেম ও শাসকদের ইচ্ছানুযায়ী আমরা কক্ষনো নিজেদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারব না।

পাকিস্তানে আহমদীগণই কেন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না ? তারা বলে যে, তোমরা (আহমদীরা) তখনই তোমাদের প্রাপ্য অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে যখন ঘোষণা দেবে,'' আমরা মুসলমান নই এবং আমরা মহানবী(সা.) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নই''। খোদার কসম! সব আহমদী টুকরো টুকরো হওয়া পছন্দ করতে পারে, কিন্তু এমন স্বাধীনতা এবং ভোটাধিকারের উপর তারা থুথুও ফেলে না যা আমাদেরকে আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এমন স্বাধীনতা তোমরা দুনিয়ার কীটরা উপভোগ কর। আমরা এমন স্বাধীনতার উপর সেই দাসত্বকে প্রাদান্য দেই যা আমাদেরকে মহানবী (সা.) এর জুতার ধূলি বানিয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত দাসত্বের গন্ডিভূক্ত করবে। যারা আল্লাহ্‌র অধিকার আদায়ের মর্মবুঝে তা আদায় করে এবং বান্দার অধিকার আদায়ের মর্ম বুঝে তা আদায় করে। ইনশাআল্লাহ সেই দিন আসবে যখন আমাদের এ বিনয় ও দাসত্ব পৃথিবীবাসীকে সত্যিকার স্বাধীনতার দৃশ্য দেখাবে। যারা স্বাধীন হওয়ার আত্মপ্রসাদ নিচ্ছে তারা প্রকৃতপক্ষে দাসত্বের শৃংখলে বাঁধা। যারা বোঝা তলে চাপা পড়ছে এবং গলার বেড়ির বোঝায় জর্জরিত একদিন এরা বা এদের বংশধরগণ মসীহ্ মুহাম্মদীর দাসত্ব বরণ করে গর্ব অনুভব করবে। এর মাধ্যমে তারা সেই সত্যিকার স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে পারবে যা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এসেছিলেন।

আল্লাহ্ করুন, পৃথিবীবাসী যেন এ স্বাধীনতার দিন শীঘ্রই দেখতে পায় এবং সেই সকল ভয়াবহ পরিনতি থেকে যেন রক্ষা পায় যা আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিতদের অস্বীকারের ফলে সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল আহমদিকে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সাথে কষ্টের দিনগুলো দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন, আমীন ।

হযরত আলী (রা.)

মূল: ফজল আহমদ, ইউকে

ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ

(তৃতীয় কিস্তি)

হযরত আলীর (রা.) বিভিন্ন অর্জন

ধার্মিকতা, অসাধারণ জ্ঞান ও সাহসিকতার জন্য পরিচিত ছিলেন হযরত আলী (রা.)। মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করতো। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই তিনি কুরআন মুখস্থ করেছিলেন এবং তা মহানবী (সা.)-কে শুনিয়েছিলেন। আর, পরবর্তীকালে তিনি এই ধর্মগ্রন্থের একজন বিশেষজ্ঞ অথরিটিতে পরিণত হন।

আলী (রা.) শুধু হাফেজ-এ-কুরআনই ছিলেন না, কখন কোন আয়াত নাজিল হলো, কোথায় এবং কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হলো ইত্যাদি অর্থাৎ প্রতিটি আয়াতের পটভূমি/শানে নজুল তিনি জানতেন। প্রায় ত্রিশ বছর মহানবী (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকার ফলে তিনি হাদীস ও সুন্নাহরও অথরিটিতে পরিণত হন। শত শত হাদীস কণ্ঠস্থ করেছেন তিনি। সেসব হাদীস তিনি প্রায়ই বর্ণনা করতেন এবং কুরআন ও হাদীসের বরাত দিয়ে চমৎকার বক্তৃতা করতেন।

কুরআনের গভীর জ্ঞান থাকার কারণে এটি স্বাভাবিক বিষয় যে, তিনি ইসলামী আইনের অথরিটি হিসেবে বিবেচিত হবেন। আয়েশা (রা.) বলেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে:

"তার জন্য, [আলী], যারা সুন্নাহর মধ্যে আছে তাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে।"

একইভাবে, আবু হুরায়রাহর এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত উমর (রা.) বলেছেন:

"বিচারসংক্রান্ত ফয়সালার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে আলী সর্বোত্তম।"

বাকি খলিফাদের মতো হযরত আলীও (রা.) খুব সাদাসিদা জীবনযাপন করতেন। মুসলমান হিসেবে তাকে সঙ্কটময় কাল অতিবাহিত করতে হয়েছে। এমনিতেও তিনি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনই বেশি পছন্দ করেছেন। তিনি সাদামাটা পোশাক পরিধান করতেন এবং সাধারণ খাবারই খেতেন। সর্বদাই তিনি অপরের কল্যাণসাধনের প্রতি খেয়াল রাখতেন। প্রায়ই না-খেয়ে থাকতেন। এমনকি খলিফা হওয়ার পরও তিনি সেই আগের মতোই সাদাসিধা জীবনযাপন করেছেন এবং মুসলমানদের জামা'তের খেদমতে সদা-সতর্ক থেকেছেন। কোনো কোনো বিবরণে দেখা যায়, [এক বেলার] খাবার হিসেবে তিনি এক পেয়ালা দুধ, এক টুকরো রুটি এবং সামান্য সব্জী খেতেন।

তার চারপাশের অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের মতো কোনো প্রকারের আড়ম্বর ছাড়া সাধারণ ঘরেই বসবাস করতেন তিনি।

একটি ঘটনায় দেখা যায়, একবার তিনি ও তার স্ত্রী ফাতিমা (রা.) শুকনো রুটি খাচ্ছিলেন। তখন এক ফকির তাদের দরোজায় এসে খাবার চায়। তারা সেই সামান্য রুটিটুকু ফকিরকে দিয়ে দেন এবং দিনের বাকি সময় না-খেয়েই অতিবাহিত করেন। ছেলেদেরকেও তিনি সেই একই শিক্ষা দিয়েছেন। ছেলেদেরকে তিনি বলেছেন:

"সৎসঙ্গে বাস করো, অসৎসঙ্গ পরিহার করো। সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার যা তুমি খাও তা হলো হারাম পথে উপার্জিত খাবার। মানুষের প্রতি সদয়চিত্ত হও, এমনকি কেউ যদি তোমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে, তার সঙ্গেও [সদয়চিত্ত হও]। কেননা, পরবর্তীতে সেই ব্যক্তিও তোমার প্রতি সদয়চিত্ত হয়ে যাবে।"

আপাতদৃষ্টিতে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ কেবল ধারাবাহিক সংগ্রাম ও লড়াইয়ের যুগ বলে মনে হতে পারে; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রচেষ্টা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে সুপ্রশিক্ষিত, উদ্যমী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের এক কেন্দ্রীয় দল তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল না। মূলত, এটা ছিল তাদেরই ধারণকৃত পারস্পরিক ভালবাসা, সহমর্মিতা, ন্যায়-আচরণ ও জ্ঞান-পিপাসার বিভিন্ন মূল্যবোধ, যার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় স্পেনের আন্দালুস ও বাগদাদের বাইতুল হিকমার মতো ইসলামের পরবর্তী স্বর্ণযুগগুলোতে।

হযরত আলীর (রা.) মৃত্যু

মুসলমানদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও ক্রমবর্ধমান বিভেদ অবশ্যম্ভাবী শঙ্কায় পরিণত হচ্ছিল। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে কুফা নগরীতে হযরত আলী (রা.) নিহত হন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি যখন ফজর নামাজ পড়াচ্ছিলেন, তখন আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম নামক এক খারেজি গুপ্তঘাতক তাকে আক্রমণ করে। দু'দিন শয্যাশায়ী থাকার পর তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে তার ছেলে হাসানের কাছে তিনি নিম্নোক্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করেন:

"আলাহকে ভালবাসো ও তার আনুগত্য করো। আলাহর পথের পথিকদের খেদমতের জন্য বাঁচো। আর, তোমার উৎকৃষ্ট সময়ে আলাহর নৈকট্য অর্জনের বিষয়টি ভুলে যেও না। তোমার প্রতিটি মুহূর্তই তার জন্য হবে, যদি তুমি আন্তরিকভাবে তোমার লোকদের সেবায় তা কাজে লাগাও।"

আশ্চর্যজনকভাবে তিনি তার ছেলেদেরকে নির্দেশ দিলেন, তার হত্যাকারীকে যেন নিগৃহীত করা না হয়। তিনি তার ছেলেদেরকে এই হুকুমও দিলেন, হত্যাকারীকে যেন খাবার প্রদান করা হয় এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করা হয়। স্বীয় হত্যাকারীর প্রতি এই ধরনের দয়ার্দ্র ব্যবহার থেকে তার চরিত্রের অনুপম চিত্র প্রকাশিত হয়। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:

"লোকটির সঙ্গে দয়ার্দ্র ব্যবহার করো এবং

তাকে খাবার ও পানি দাও। আমি যদি মারা যাই, তবে তার সঙ্গে ন্যায়বিচার করো। আর, যে-কাজ সে করেছে, তার জন্য তাকে কতল করা হবে। কিন্তু, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহমূলক আচরণ করো না। কেননা, মহানবী (সা.) এরকমটি করতে নিষেধ করেছেন।

বলা হয়ে থাকে যে, আলীর (রা.) মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ গোপনে দাফন করা হয়েছে। কারণ, আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, তার শত্রুরা হয়তো তার কবরের অসম্মান করবে। খলিফা হারুন আল-রশীদের (শাসনকাল: ৭৮৬ - ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলের আগ পর্যন্ত তার কবরের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে সংশয় ছিল। খলিফা হারুন আল-রশীদকে কোনো ব্যক্তি বলেন যে, হযরত আলীর (রা.) কবর রয়েছে নাজাফের একটি উঁচু স্থানে। *[নাজাফ ইরাকের একটি শহর। এটি বাগদাদের দক্ষিণ দিকে প্রায় ১৬০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। অনুবাদক]* খলিফা হারুন আল-রশীদের হুকুমে সেখানে একটি বড় মসজিদ এবং মাজার নির্মাণ করা হয়। কথা হলো, তিনি কীভাবে জানলেন যে, সেখানেই হযরত আলীর কবর রয়েছে? এই সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনায় দেখা যায়, ষষ্ঠ শিয়া ইমাম জাফর আল-সাদিক তাকে একথা জানিয়েছেন। আর, জাফর আল-সাদিক এই তথ্য পেয়েছেন তার পূর্ববর্তী শিয়া নেতাদের কাছ থেকে। তবে, শিয়াদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ এখনো বিশ্বাস করে যে, হযরত আলীর (রা.) আসল কবর রয়েছে আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফের রওজা-ই-শরীফে। এটি নীল মসজিদ নামেও পরিচিত।

হযরত আলীর (রা.) উত্তরাধিকার

ইসলামের একজন অথরিটি হিসেবে হযরত আলীকে (রা.) বিবেচনা করা হতো। তার বক্তৃতাসমূহ এবং বিভিন্ন চিঠিপত্র 'নাহজুল বালাগাহ' (বাগ্মীতার শিখর) শিরোনামে সংরক্ষিত আছে।

তার ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে তার পরিবারও মানুষের সেবা করে গেছে। তার ছেলেরা, হাসান এবং হুসাইন দু'জনেই এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এটা মনে করা হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে আরো মতবিভেদ এড়ানোর জন্য হাসান খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ফলে মুয়াবিয়াহ খলিফা হতে সমর্থ হন। মুয়াবিয়াহর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ পরবর্তীকালে আরবের উমাইয়া রাজবংশ নামে পরিচিতি লাভ করে। তার ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে খোলাফায়ে-রাশেদিনের (সঠিক পথপ্রাপ্ত খেলাফতের) সমাপ্তি ঘটে। মুসলিম সাম্রাজ্যের পরবর্তী শাসকেরা বিভিন্ন রাজবংশের নামে দীর্ঘকাল শাসন করেছে। অবশেষে ওসমানিয়া (Ottoman) সাম্রাজ্যের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই খেলাফত বিলুপ্ত হয়।

যাহোক, শিয়াদের চোখে হযরত আলী (রা.) হচ্ছেন প্রথম ইমাম। অতঃপর, তার ছেলেরা এই আলখালার অধিকারী। দ্বিতীয় ইমাম হলো হাসান এবং তৃতীয় ইমাম হলো হুসাইন। হাসান এবং হুসাইয়েনের রক্তের ধারায় হযরত আলীর (রা.) পরবর্তী বংশধরেরাই হচ্ছে ফাতেমার ধারায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৈহিক বংশধর। আজো তারা 'সৈয়্যদ' উপাধি নিয়ে অশেষ সম্মানের অধিকারী।

এই বংশধারার উদাহরণ হিসেবে মরক্কোর শরীফগণ এবং ইদ্রিসীয়গণ, ঘানার বনু সালেহগণ হাস্‌সানের পৌত্রদের বংশধর। আর ইয়েমেনের সুলেমানীয়রা হাসানের ছেলের বংশধর।

মুসলমানদের একতার বিষয়টিই হযরত আলীকে (রা.) সবচেয়ে বেশি বিচলিত করেছিল। চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চতুর্দিক থেকে আবেদন আসা সত্ত্বেও, সবগুলো দলকে একত্রিত করার জন্য ক্রমাগতভাবে সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই, অধিকতর নরমপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। এমনকি অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতেও, যখন কিনা মুসলমান সৈন্যদের মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হয়েছিল তাকে, তখনো তার অভিপ্রায় ছিল মধ্যস্ততা ও আলোচনা-সংলাপের প্রতি। যাহোক, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অভিপ্রায়ের সঙ্গে ঈমানের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ফলে হযরত আলীর (রা.) সদিচ্ছা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

হযরত আলীর (রা.) অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার হচ্ছে তার দ্বারা বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত বাণী (হাদীস) এবং কর্মের (সুন্নাহ) বিবরণসমূহ। তিনি ৫৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসগুলো তার কাছ থেকে অন্যান্য বহু লোক শুনেছেন এবং বর্ণনার ধারাবাহিক শৃঙ্খলের অংশে পরিণত হয়েছেন। যেমন, তার ছেলে হাসান ও হুসাইন এবং তারপর আবু মুসা, আবু ইমামাহ এবং আবু হুরায়রাহ।

শিয়াদের মধ্যে বিভক্তি

অচিরেই ইসলামে বহু ফির্কা/উপদল তৈরি হলো। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উলেখযোগ্য হলো সুন্নী এবং শিয়া। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত আলীর (রা.) কিংবা হযরত আয়েশার (রা.) কি এ রকম অভিপ্রায় ছিল? এটি সুনিশ্চিত যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ, যারা মক্কাবাসীদের হাতে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছিল, তারা অবশ্যই বিভক্তি এবং অন্তর্কলহের বিপরীতে একতা এবং ভালবাসা চাইবেন।

তাহলে এই বিভক্তির পেছনে কোন কোন ঘটনা ও কারণ রয়েছে?

ভিতরে ভিতরে আরবে ইসলামের রাজনীতিকরণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টির চাপা-স্রোত ছিল। সেখানে নিকটবর্তী ইরানের নতুন অনুগামীদেরকে বলা হয়েছে যে, মুসলমান হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য তাদের দরকার একজন আরব পৃষ্ঠপোষক। মহানবী (সা.)-এর কাছে কতিপয় আরব চেষ্টা করেছিল রাজনৈতিক এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে তাদের 'শেয়ারড ন্যাশনালিটি' ব্যবহার করতে।

ইরানীরা চেয়েছিল ইসলাম ধর্মের উৎসমূলে প্রত্যাবর্তন করতে। কারণ, তারা অনুভব করেছিল মহানবী (সা.)-এর সরাসরি পরিবারের মধ্য দিয়েই এটি একমাত্র সম্ভবপর। আর, হযরত আলীর ছেলেদের পরিবারবর্গই এই প্রতিনিধিত্ব করে। তাই, হযরত আলীর (রা.) শাহাদাত এবং একজন রাজনীতিক আরবের [মুয়াবিয়াহ] হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার ঘটনাটিকে তারা বিপর্যয় হিসেবে দেখেছে। আর যখন, হুসায়েন ও তার অনুগামীরা কয়েক বছর পর, ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শহীদ হন, তখন এই ঘটনাও শিয়াদের মর্মজ্বালা ও দুঃখবোধকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এ সমস্ত ঘটনার কথা স্মরণ করে শিয়ারা আজো শোক প্রকাশ করে থাকে। প্রতি বছর ১০ মুহাররাম তারা নিজেদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে ইমাম হুসায়েনের শাহাদাতের কথা স্মরণ করে। শিয়াদের মধ্যে কেউ কেউ জায়নামাজে কারবালার মাটি রেখে সেজদা করে থাকে।

এটি বড় আকর্ষণীয় বিষয় যে, আল-সাইয়ুতি বলেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন:

"রাসূলুলাহ - আলাহ তাকে ও তার পরিবারের প্রতি রহম করুন এবং শান্তি বর্ষণ করুন - আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, 'আলী, তোমার সঙ্গে ঈসার (আ.) সাদৃশ্য রয়েছে; ইহুদীরা তাকে এতোটাই ঘৃণা করেছে যে, তারা তার মায়ের নামে অপবাদ দিয়েছে। আর খ্রিস্টানরা তাকে এতো ভালবেসেছে যে, তাকে এমন স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে যা তার প্রাপ্য নয়।'"

মহানবী (সা.) হয়তো জানতেন যে, আলীর (রা.) খেলাফত কালে সে চক্রান্তকারীদের হাতে নিগৃহীত হবে। কিন্তু, পরবর্তী প্রজন্মগুলো তাকে খ্রিস্টানদের মতোই অতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে [পূজা করবে]। যেমন, আলীর (রা.) নামে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়ে থাকে (ইয়া আলী মদদ)।

উপসংহার

পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো হযরত আলীরও (রা.) সরাসরি সম্পর্ক ছিল মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনি একেবারে প্রথম দিকের ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আরবের বাইরের দুনিয়ায় ইসলাম বিস্তৃত হচ্ছিল বিধায় ন্যায়বিচারের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন। কুরআন সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। অল্প বয়সেই হাফেজ-এ-কুরআন হয়েছেন এবং মহানবী (সা.)-কে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন তিনি। আর মহানবী (সা.)-এর কাছে তিনি কুরআনের মর্মার্থও শিখে নিয়েছেন।

আলী (রা.) যদিও সংশয়াতীতভাবে অত্যন্ত সাহসী ছিলেন; তথাপি, তাকে ঘিরে আবর্তিত হওয়া রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফলে অবশেষে তার পতন ঘটে এবং এভাবে খোলাফায়ে রাশেদিনেরও (সঠিক পথ-প্রাপ্ত খেলাফতের) সমাপ্তি ঘটে। তার বিশেষ মর্যাদার বিষয়ে বহু কিছুই করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে বহু সংখ্যক মুসলমান (শিয়া) আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, মহানবী (সা.)-এর পর খলিফা হওয়ার ন্যায্য অধিকার একমাত্র হযরত আলীরই (রা.) ছিল।

আজকাল তার নামে যে-সব দাবী উত্থাপন করা হয় এবং তার সঙ্গে অন্য খলিফাদের যে পার্থক্য টানা হয়, সে-সব বিষয়ে হযরত আলী (রা.) কিছুই জানতেন না। বরং, এর বিপরীতে, পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রতি তার পরিপূর্ণ আনুগত্য দেখা যায়। আর, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রেও তার অনিচ্ছুক মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু, যখন তিনি খলিফা হয়ে গেলেন, তখন মুসলিম উম্মতের একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন।

আঠারো শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড গিবনের মন্তব্য তুলে ধরে এই লেখা শেষ করা যায়। গিবন বলেন:

"প্রথম সারির সত্যিকারের মুমেনগণ হয়তো কামনা করবেন ইহকালে এবং পরকালে সামনে চলতে; এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি বেশি সিরিয়াস এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তারপরও কোনো নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তির পক্ষে আলীর উদ্দীপনা ও গুণাবলীকে কখনোই পিছনে ফেলা সম্ভব হবে না। [কারণ,] তিন ছিলেন একাধারে কবি, সৈনিক এবং দরবেশ। তার প্রজ্ঞার ছোঁয়া এখনও পাওয়া যায় নৈতিক এবং ধর্মীয় বাণীর সংকলনগুলোর মাঝে। আর, মৌখিক বিতর্ক কিংবা তলোয়ারের লড়াই-ই হোক, সমস্ত বিরুদ্ধবাদী নতি শিকারে বাধ্য হয় তার বাগ্মীতা ও পরাক্রমের কাছে।"

(শেষ)

[The Review of Religions, December 2007 অবলম্বনে]

References

1. *The Concise Encyclopaedia of Islam,* Cyril Glasse, Harper San Francisco, 1999.
2. *Life of Muhammad,* Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Islam International Publications Ltd, Tilford, UK, 1990.
3. *Islam - a short history,* Karen Armstrong, Phoenix Press, London 2001.
4. *The Preaching of Islam,* T. W. Arnold, Aryan Books International, New Delhi, 1998.
5. *Al-Quds,* Mohammad Abdul Hameed Al-Khateeb, Ta-Ha Publishers, London 1998.
6. *Intrigues against Khilafat-i-Rashida and their Impact,* Maulana Sheikh Mubarak Ahmad, Ascot Press, London.
7. *Khulafa-e-Rashideen,* Majeed A Mian, *Review of Religions,* Vol.92, No.3, March 1997.
8. *The Book of Character - writings on character and virtue from Islamic and other sources,* Camille Helminski, The Book Foundation, Bristol 2004.
9. *The History of the Khalifas who took the right way,* Jalaladdin as-Suyuti, Ta-Ha Publishers, London 2006.
10. *Nubuwwat & Khilafat - Prophethood and its successorship,* Islam International Publications Ltd, Tilford, UK, 2006.
11. *The Excellent Exemplar: Muhammad the Messenger of Allah,* Muhammad Zafrulla Khan, The Chaucer Press, UK, 1962.
12. *'Ali Bin Abi Talib - the fourth Caliph of Islam,* Abdul Basit Ahmad, Darussalam Publishers, London, UK, 2001.
13. *The Muqaddimah - an introduction to History,* Ibn Khaldun, Princeton University Press, New Jersey, USA, 2005.
14. *The Decline and Fall of the Roman Empire,* Edward Gibbon, Volume 5, p.381, London, 1858.

প্রসঙ্গ : নামায ও দোয়া

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

দোয়া ও নামাযের সম্পর্ক তদ্রুপ, যদ্রুপ সম্পর্ক ফুলের সাথে তার সুগন্ধির। চিত্তকার্ষক গন্ধ যেমন ফুলের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে তেমনিভাবে আকুতিভরা দোয়ার কান্নাও নামাযের একাগ্রতাকে বৃদ্ধি করে। মূলত: নামায দোয়ারই অপর নাম। অর্থাৎ দোয়া সমূহকে পদ্ধতিগতভাবে খোদা সমীপে উপস্থাপন করার কানুনের নামই হলো নামায। ফরাক কেবল এটুকুই যে, যেকোন দোয়া যেকোন স্থানে যেকোন সময় পড়া যায়। কিন্তু নামায সেভাবে আদায় করা যায় না। পরন্তু নামায সময় মত নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে গুছানোভাবে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে আদায় করতে হয়।

দোয়া হলো কোন খাঞ্চায় (ঝুড়ি) রাখা বিভিন্ন প্রজাতির ফুল সমূহের সমাহার আর নামায হলো সেই ফুলগুলির সমন্বয়ে তৈরী অপরূপ সুন্দর একটি মালা। আত্মা যেমন দেহকে ছাড়া নয়। তেমনিভাবে নামাযও দোয়াকে বাদে নয়। নামাযে কৃত দোয়ার ক্রন্দন ধারায় মানুষ আরেকটি আধ্যাত্ম জীবন লাভ করে। রাজার বিশিষ্ট কর্মকর্তা যেমনিভাবে রাজার সন্নিকট গিয়ে প্রজার সব আরজি সমূহকে আদেশে পরিণত করে তেমনিভাবে নামাযও বান্দার সব দোয়াগুলিকে খোদার নৈকট্যে পৌঁছে দিয়ে তা কবুলিয়তের মর্যাদায় পরিণত করে অর্থাৎ খোদার সান্নিধ্যে গিয়ে স্বয়ং খোদা সকাশে দোয়া সমূহ সমর্পন করার ব্যবস্থাপনার নামই হলো নামায। কেননা নামায আদায় কালেই মানুষ খোদার সবচে নৈকট্যে অবস্থান করে।

"হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার পাপকে ক্ষমা কর এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলিকে খুলে দাও"। নামাযের প্রারম্ভে হৃদয়ের আবেগ নি:সৃত মহান এ দোয়া পাঠের মাধ্যমেই নামাযীকে প্রবেশ করতে হয় মসজিদ বা সেজদা-গাহে। যেখানটার পরিবেশ অবশ্যই পরিশুদ্ধ এবং অতীব পবিত্র। খোদার উপস্থিতি যেখানে নিশ্চিত এবং তাঁর অনুগ্রহ এখানে সর্বত্র বিরাজমান। এখানে দাঁড়িয়েই নামাযী তার স্বীয় আত্মার আবেগ মিশ্রিত দোয়া দিয়ে শুরু করে তার নামায।

অত:পর নামাযীর আরেক দোয়া হলো, "হে আমার খোদা! তুমি অবগত হও, আমার সম্পূর্ণ ধ্যান একনিষ্ঠভাবে তোমারই দিকে নিবদ্ধ। আর আমি মোটেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই", এ যেন হৃদয়ের আপ্লুত আবেগের এক বিদগ্ধ প্রকাশ। পরম দয়ালু খোদার চরম সহানুভূতি আকর্ষণ করার প্রাণবন্ত এক আরজি। নামাযী এমনিতর আকুতি ভরা দোয়াকেই উপস্থাপন করে প্রার্থনা গ্রহণকারী খোদার সকাশে আর তিনি কবুলিয়তের আশ্বাস দিয়ে প্রশান্ত করেন নামাযীর বিলাপ বিজড়িত আত্মাকে।

তৎপর নামাযে সংশ্লিষ্ট অন্য আরেক দোয়া হলো, হে আল্লাহ্! তুমি সর্বোচ্চ পবিত্র এবং সমস্ত পবিত্রতা তোমারই। আমাদের যতসব প্রশংসা তোমাকে ঘিরে তোমারই উদ্দেশ্যে। কেননা তুমি পরম মঙ্গলময়, তোমার নামসমূহ মঙ্গলাধার। আমাদের যতসব মঙ্গল প্রয়োজন তা তোমা থেকেই আগত। আমাদের প্রয়োজনীয় মঙ্গল প্রদানের মালিক একমাত্র তুমিই। তোমার মর্যাদা অতি উচ্চে, সবার উর্ধ্বে। অতএব তোমাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা, কাউকে উপাস্য করা কোন মু'মিনের কাজ নহে (সানা)। মহা কল্যাণাধার প্রভুর স্মরণে বিগলিত বিমলাত্মার এই আরাধনা, বিজনে নির্জনে নতচিত্তের এই প্রার্থনা নামাযকে সমৃদ্ধ করে, করে একনিষ্ঠ। অত:পর এই নামায নামাযীর কাতর-কান্নার সব দোয়াকে একান্ত একাকিত্তে খোদার হস্তে পৌঁছে দেয়। নামাযে বিমোহিত নামাযীর পবিত্র হাত যখন এসব দোয়া ও আরজি খোদার সমীপে যাচনা করে তখন দয়ার্দ্র খোদা আর তা উপেক্ষা করে ফেরত দিতে পারেন না। কেননা এটা তার ফিতরৎ তথা মহৎ মহান বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। নামাযীর কাতরাত্মা তখন খোদার পরিবারভুক্ত পবিত্র সদস্য হয়ে যায়। ফলে খোদার স্নেহাশীষ সেই সদস্যের সদয় কান্নাকে আর ফিরিয়ে দেন না। বরং খোদা তা গ্রহণ করত: কবুলিয়তের মর্যাদা দান করেন। পক্ষান্তরে এককভাবে কেবল দোয়া সদা সর্বদা সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না এবং সেরূপ পরিবেশও সৃষ্টি করতে পারে না যা নামায দ্বারা সম্ভব। তাই দোয়াকে পরিস্ফুটিত পুষ্প কাননে পরিণত করান জন্য নামাযের প্রয়োজন।

অত:পর নামাযের আরেক দোয়া হলো, "আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে" (তাআব্বুয)। শয়তান সারাক্ষণই মানুষকে বিপথগামীতায় পা বাড়াতে তাড়িত করে, শয়তানী কর্ম করার প্ররোচনা দেয়। কিন্তু নামাযের একনিষ্ঠ একাগ্রতা নামাযীকে শয়তানের এহেন অশুভ ছোবল থেকে হেফাজত রাখে, তাকে নিরাপদে রাখে। পবিত্র কুরআন অঙ্গীকার করে যে, "নিশ্চয়ই নামায (নামাযীকে) সকল প্রকার অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে"। (সূরা আনকাবূত : ৪৬) এটাই হলো নামাযের অনন্য বৈশিষ্ট্য। বলতে কী, শুধু দোয়ার দ্বারা এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কখনো তার দৃঢ়তায় স্থির থাকতে পারে না। ফলে দৈবাৎ তার পদস্খলন ঘটে যায়, কিন্তু নামাযের মাধ্যমে যে দোয়া, তা তাকে দৃঢ়তার অবস্থানে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রাখে, তাকে অনড় অবিচল রাখে। কেননা নামায ততক্ষণ নামাযীকে তার দর্শন, শ্রবণসহ জাগতিক সব সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত রাখে।

এ পর্যায়ে পৌঁছে নামাযী তখন আপ্লুত আবেগে নত আত্মায় যাচনা করে অযাচিত অসীম খোদার দরবারে যিনি স্বঘোষিত বারংবার কৃপাকারী ও পুণ্য কর্মের অনুকম্পা দানকারী, যিনি জগৎসমূহের প্রভূ-প্রতিপালক ও বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিক। আমরা এমন ক্ষমতাধর খোদার উদ্দেশ্যে দোয়া করি এবং ইবাদত করি আর প্রাপ্তির বাসনা করি জাগতিক জীবন চলার সহজ সরল পথ ও পাথেয় এবং স্বর্গীয় সর্বোৎকৃষ্ট এনাম। (সূরা আল ফাতেহা)।

এ পাওয়ার বাসনা আমরা কার কাছে করব? কার কাছে করা উচিত? তাঁর কাছেই যাঁকে আপন আত্মা স্বত:স্ফূর্তভাবেই বলে, "তিনি আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সর্ব নির্ভর স্থল, যাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই" (সূরা আল ইখলাস)। অত:পর নামাযীর আরেক দোয়া হলো– হে খোদা! তুমি অতীব পবিত্র এবং অতীব মহান (রুকুর তসবীহ)। এ পর্যায়ে আমরা নিশ্চিত যে, খোদা তাঁর ভক্ত বান্দাগণের আহাজারী দোয়া ও প্রশংসা অবশ্যই শুনেন। (তাসমীয়া)। এই প্রশংসা অফুরন্ত, পবিত্রময় এবং এর মাঝে রয়েছে এন্তার কল্যাণ (তাহমীদ)। অতএব যে খোদা এতসব মর্যাদা ও কল্যাণাধার তার স্থান অবশ্যই সবার ঊর্ধ্বে (সিজদার তাসবীহ)। খোদার এহেন মহানুভবতা দয়া ও শক্তির চিত্র অনুভবে সততই বলে উঠে, "হে মহা মহীম খোদা! তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে সুপথে পরিচালিত করো, আমাকে সুস্থ রেখো। আমাকে রিযক দান করো, এবং আমার পাপসমূহ মার্জনা করত: ঐশী অসীম উন্নতি দান করো" (দুই সিজদাহর মধ্যবর্তী দোয়া)। এমনিতর অসম্ভব সব সুন্দর সমৃদ্ধ ও অসাধারণ সব দোয়ার সমন্বয়ের নামই হলো নামায। নামাযের প্রতিটি অঙ্গ-কর্মের অন্ত:স্থলেই রয়েছে খোদার প্রেমাকর্ষণের এমনি সব সহস্র দোয়ার পুণ্য সম্পদ।

অত:পর নামাযীর আরেক দোয়া হলো–হে আমার প্রিয় খোদা! আমার মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত কেবল তোমারই জন্য, কেবল তোমারই সৌজন্যে, হে আমার নবী! শ্রেষ্ঠ নবী! আমি কেবলই আপনার বদৌলতে পরমেশ্বর খোদার অনুকম্পা প্রাপ্তির আশাবাদী এবং তা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। তাই আপনার উপর বর্ষিত হউক স্বর্গ-শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও কল্যাণ, শান্তি বর্ষিত হউক আল্লাহ্‌র সব নেক বান্দাগণের ওপর। হে আল্লাহ্! আমার সাচ্চা অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে, তুমিই একমাত্র উপাস্য, তুমি ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কেউ নেই এবং জমিন ও আসমানের প্রশংসিত সত্তা (মুহাম্মদ) তোমার বিশিষ্ট বান্দা ও রাসূল (তাশাহুদ)।

হে আল্লাহ্! মহা মর্যাদাবান এই রাসূল ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি সেরূপ আশীষ বর্ষণ করো যেরূপ আশীস বর্ষণ করেছিলে অতীতের নবী ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর প্রিয় অনুগামীদের প্রতি। আমি নির্দ্বিধায় বলছি যে, তুমি চিরন্তন মহা প্রশংসাময় ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি কল্যাণ বর্ষণ করো মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর প্রিয় অনুগামীদের প্রতি যেরূপ কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি। আমি আবারো বলছি যে, তুমি নিরন্তর মহা প্রশংসাময় ও মহা মর্যাদাবান (দরূদ)। এরপর নিরঞ্জন খোদা সকাশে নামাযীর ভক্তিপ্লুত হৃদয়ের আরেক দোয়া হলো, হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক খোদা! তুমি আমাদেরকে ইহ এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান করো এবং আগুনের ভয়ংকর আযাব থেকে রক্ষা করো, হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাকে এবং আমার সন্তান-সন্ততিগণকে নামাযে কায়েম করো, হে আমাদের মহান প্রভু প্রতিপালক! পরকালে হিসাব কায়েম করার দিনে তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সকল মু'মিনকে ক্ষমা করো (দোয়া মাসুরা)।

খোদার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.)-এর ওপর হাজার দরূদ ও সালাম প্রেরণ পূর্বক নামাযী এমনিভাবে শেষ করে তার নিত্যদিনের ফযর, যোহরসহ অন্যান্য নামায। অত:পর আবারও সেই একই দোয়া, "হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা করো এবং তোমার অনুকম্পার বদৌলতে তুমি আমার জন্য তোমার দয়ার দ্বারগুলিকে খুলে দাও"। এরপর ঐ মসজিদের উন্মুক্ত দরজা দিয়েই পুন: নামাযী ছুটে চলে তার নির্ধারিত কর্মস্থল জাগতিক চারণ ভূমিতে। পার্থিব রিযক তালাশে, আপন জীবন লালনের সন্ধানে।

বন্ধুগণ! এতক্ষণের আলোচনায় নিশ্চয় আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, দোয়া ও নামাযের সম্পর্ক কী? মানবাত্মাকে খোদার নৈকট্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে কে কী ভূমিকা পালন করছে। বিষয়টি ব্যাপক, এতদসত্ত্বেও খুবই সংক্ষিপ্তাকারে তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত: দোয়ার ভান্ডার হলো কুরআন। আর সেই কুরআনকে ঘিরেই হলো নামায।

নামাযের মাধ্যমে দোয়া মানুষকে খোদার নৈকট্যে পৌঁছে দেয়। খোদার একান্ত একজনে পরিণত করে। নামাযে পঠিত দোয়াসমূহকে যদি কেউ কবুলিয়তের মর্যাদায় উন্নীত করতে পারে তবে নিশ্চয় তিনি সার্থক, তিনি সত্য সাধক, তিনি ধন্য। আত্মা তার পবিত্র, শান্তি প্রাপ্ত। সেই আত্মা ইহ ও পরকালে উভয় জগতেই নিরাপদ। স্বর্গে তিনি স্বাগতম, সম্মানিত। জান্নাত তার অনিবার্য, কেননা শাশ্বত বাণী হলো, "আস্‌সালাতু মিরাজুল মু'মিনিন"। দোয়া সম্বলিত নিষ্ঠাবান নামায নিশ্চয় নামাযীকে ঐ মাকামে পৌঁছে দিতে পারে যা প্রত্যেক আত্মার জন্য খোদা কর্তৃক নির্ধারিত। তবে নিরবধি এ নামাযে থাকতে হবে একাগ্রতা, স্বচ্ছতা, সততা ও প্রবঞ্চনা মুক্ত একনিষ্ঠ খোদাপ্রেম। এ প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি হামদ, দরূদ, তাহমীদ তসবীহ্ ও তকদিস ইত্যাদি সহকারে দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে"।

তিনি (আ.) আরো বলেন, "যে নামাযকে ছেড়ে দিল সে আহমদীয়াত হতে বাদ পড়ে গেল" নামাযের গুরুত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ্ আর রাবে (রাহে.) বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেকের জীবনে নামাযকে প্রতিষ্ঠিত কর। আহমদীয়াতের দ্বিতীয় শতাব্দিতে প্রবেশের পূর্বে তোমাদের মধ্যে যেন এমন কেহই না থাকে যেকিনা নামায পড়া থেকে বিরত থাকে"। নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের প্রধান বাবা গুরু নানক বলেছেন, "যে মস্তক নামাযে আল্লাহ্‌র দরগায় মাথা নত করে না, তার মাথা কর্তন করত: গর্দান হতে পৃথক করে তা চুলার আগুনে পুড়িয়ে ফেলা উচিত" (গ্রন্থ সাহেব, পৃ:১২৭৮)। উল্লেখিত প্রতিটি উক্তিই প্রত্যেকটি আহমদীর জন্য অত্যন্ত আগ্রহভরে সদা পালনীয় এক অনুশাসন, পথের পাথেয়।

সুতরাং আবারও সেই দোয়া, আবারও সেই আরজ: হে আমার খোদা! তুমি আমাকে আমাদের প্রত্যেককে সেরূপ নামাযী কর যে আদলে নামায পড়াকে, যে চরিত্রের নামাযী হওয়াকে তুমি পছন্দ কর। তুমি আমাদেরকে নামাযে অনুরাগী কর, পাবন্দ কর, নামাযের প্রেমিক কর, ভক্ত কর। নামাযে একান্ত নিষ্ঠাবান থাকা অবস্থায় এবং এর মাধ্যমে আমাদের সমস্ত দোয়া কবুলিয়তের অঙ্গীকার দিয়ে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর যেন অত:পর আমরা আমাদের কবর হতে এই আওয়াজ শুনতে পাই, "হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি (তাঁর প্রতি) সন্তুষ্ট এবং তিনিও (তোমার প্রতি) সন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ কর, এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে" (সূরা আল ফাজর : ২৮-৩১)। **"আল্লাহুম্মা আন্‌তাস সালাম ওয়া মিন্‌কাস্ সালামু তাবারক্‌তা ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম।** হে আল্লাহ্! তুমি পূর্ণ শান্তি এবং তোমার নিকট হতেই সকল শান্তি। মহাকল্যাণময় তুমি, হে মহাপ্রতাপশালী, হে মহা সম্মানের অধিকারী"।

স্মরণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)

সৈয়দ মমতাজ আহমদ

জন্ম ১৮৫৩, মৃত্যু: ১৯২৬

মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব মরহুম বঙ্গীয় আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম আমীর। তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তী। তদানিন্তন ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলার ত্রিপুরা জেলার [বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা] ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে বড় মৌলানা হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি এদেশে আহমদীয়াত প্রসারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ধর্মের জন্য কি করে অনিত্য সংসারের মান-সম্ভ্রম ও অর্থ সম্পদ ত্যাগ করে অম্লান বদনে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট মস্তকে ধারন করে নিতে হয় তিনি তার জ্বলন্ত আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। শুধু আহমদী-মত গ্রহণ করার জন্য তাঁকে যে কত প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, তা বর্ণনাতীত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে তাঁর নামে পরিচিত মৌলভী পাড়ায় 'মসজিদুল মাহ্‌দী' প্রাঙ্গনে তাঁর কবর বিদ্যমান এবং কাদিয়ানের বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে তাঁর নাম ফলক (কাতবা) স্থাপিত হয়েছে।

যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তিনি পত্রালাপের এক সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছিলেন। এই চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান কালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক চিঠিতে তাঁকে লিখেন যে,....."কেননা আপনার লিখনীর মধ্যে 'রুশদ' এবং 'সাআদাতের' সুগন্ধ অনুভব করছি। সুতরাং আপনার ন্যায় একজন 'রাশেদের' (পুণ্যবান ব্যক্তির) জন্য কিছু ব্যয় করা আমার জন্য অত্যন্ত সওয়াবের এবং আখেরাতের জন্য উত্তম পুরস্কারযোগ্য বলেই মনে করি। আপনি অবশ্যই উত্তর দিয়ে কৃতার্থ করবেন।"....

ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর মাঝে সাধুতা ও রুহানিয়তের সৌরভ অনুভব করেছিলেন তা তিনি বঙ্গদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আহমদীয়াতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন বাঙালী সমাজে। জনপদকে মোহিত করেছেন ঐশী সুগন্ধির সুবাতাসে। ফলে কিংবদন্তী হয়ে আছে তাঁর ধ্রুবতারাসম বণাঢ্য জীবনালেখ্য। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান'। ইসলামের পুনর্জাগরনের বিজয়ের ক্রমধারায়, তা অম্লান থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।

বাংলাদেশের আহমদীয়া আন্দোলনের কীর্তিমান এই জ্ঞানতাপস ঋষিকল্প পুরুষকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ একটি বিশ্বাসের নাম, একটি কীর্তির নাম, একটি গৌরবের নাম। তাঁকে ঘিরেই এদেশে আহমদীয়াত আবর্তিত এবং বিকশিত হয়েছিল। তিনি এদেশে আহমদীয়া জাগরণের অগ্রদূত। তাই আমাদের এই প্রিয় বাংলাদশের মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহব (রহ.) এখনো প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশে আহমদীয়াতে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি। আর এক বছর পর আগামী ২০১৩ সালে বাংলাদেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার গৌরবময় শতবার্ষিকী জুবিলী-২০১৩ পালিত হবে....ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলের সহায় হউন, আমীন।

বড় মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের শিক্ষা জীবন ও চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্য :

বড় মৌলানা সাহেব যদিও বা তদানিন্তন বঙ্গদেশের এক বিখ্যাত পীর পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্বভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই সময়ে সহস্র সহস্র টাকা আয়ের একটা প্রকান্ড উপায় থাকা সত্ত্বেও তিনি পছন্দ করলেন না, কারণ মুরিদানের দানের উপর জীবিকা নির্বাহ তাঁর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। আরবী ফার্সী ও ধর্ম-শাস্ত্রে বিশেষভাবে বুৎপত্তি লাভ করবার প্রবল অনুরাগ ও ইচ্ছা তাঁকে বাড়ী হতে বের হয়ে প্রবাসে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা গভর্ণমেন্ট মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে আরবী ভাষা অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। মাদ্রসায় অধ্যয়ণকালে পরীক্ষায় তিনি সচরাচর ক্লাসের প্রথম স্থান অীধকার করতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, মস্তিষ্কের তেজস্বিতা ও চরিত্রের সততা শিক্ষক-মন্ডলীকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি বাল্যাবস্থা হতেই এরূপ স্বাবলম্বী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁর সুদীর্ঘ ছাত্র জীবনে পিতা কিংবা অপর আত্মীয় স্বজন কারো নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করেন নি বরং নিজেই নিজের খরচের অর্থ কষ্টে-সৃষ্ঠে উপার্জন করে নিতেন। ঢাকায় অবস্থানকালে প্রাইভেট টিউশনের বিনিময়ে ঢাকার নওয়াব বাড়ীতে আহার ও বাসস্থানের সংস্থান করে নিয়ে ছিলেন এবং মাদ্রাসায় ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করার ফলে মাসিক বৃত্তি পেতেন। এভাবেই তার ঢাকা মাদ্রসার শিক্ষা লাভ কার্য চলেছিল।

ঢাকা মাদ্রাসার শিক্ষা-লাভ শেষ হলে তিনি কলিকাতা চলে যান এবং তদানিন্তন হিদুস্থানের বিভিন্ন শিক্ষালয় পর্যবেক্ষণ করে অবশেষে লাক্ষ্ণৌ ফেরেঙ্গী মহলের জগদ্বিখ্যাত আল্লামা মৌলানা আব্দুল হাই সাহেবের অধ্যাপনার অধীনে জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। এখানকার দীর্ঘ প্রায় চৌদ্দ বছর সময়কালে শিক্ষা শেষ হলে মৌলানা আব্দুল হাই সাহেব তাঁকে হায়দারাবাদ ষ্টেটে ৫০০/- টাকা মাসিক বেতনের এক উচ্চ পদে (হায়দারাবাদ নিজামের "কাজিউল কুজ্জাত") নিযুক্ত হওয়া স্থির করেছিলেন। [শরীয়তের কাজীউল কুজ্জাত (প্রধান কাজী বা জজ) এই পদটি রাষ্ট্রীয়ভাবে অতি সম্মানজনক]। কিন্তু সৈয়দ হযরত আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব অনেক দিন দীর্ঘকাল বিদেশে থাকায় হায়দারাবাদ যেতে অস্বীকার করলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ঢাকা গভর্ণমেন্ট

মাদ্রাসার মুদার্‌রেসে ছওমের' পদের নিযুক্তি পত্রও পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তথায়ও যোগদান করেন নি। তিনি দেশে (ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়) ফিরে আসলেন।

বিশ্বস্রষ্টা তাঁকে যেন এক অজানিত মহৎ-উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই বাস করা পছন্দ করলেন।

তাঁর পিতৃ-ভবনও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অধীন অদূর জ্যেঠাগ্রামে ছিল, ইচ্ছা করলে তিনি সেখানে থেকে পৈত্রিক মুরিদান হতে অগাধ অর্থ উপার্জন ও প্রভূত অর্থশালী হতে পারতেন, কিন্তু পূর্বেই বলেছি মুরীদানের দানের উপর জীবিকা নির্বাহ করা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। পার্থিব অর্থের প্রতি তাঁর মন সাংসারিক লোকের ন্যায় প্রবলভাবে কখনও আকৃষ্ট হত না। আরবী, ফার্সি এবং ধর্ম শাস্ত্রে তিনি যে অগাধ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন তাতে ইচ্ছা করলে তিনি যে কোন উপায়ে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জন করতে পারতেন, কিন্তু পার্থিব সম্পদের আকর্ষণ তাঁকে কখনও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট বা কর্তব্যে উদাসীন করতে পারেনি। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে প্রথমে দীনিয়াত (ধর্ম) শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এক মাদ্রসা খুলেন এবং 'এলমে-দ্বীন' বা ধর্ম শাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং এর ফলেই এই অঞ্চলে বহু লোক আলেম বলে খ্যাত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুসলমান সমাজের আগ্রহে তিনি এখানকার কাজী নিযুক্ত হন।

এই সমস্ত উপায়ে তাঁর যা উপার্জন হত তাদ্বারাই ভদ্রজনোচিতভাবে জীবিকা নির্বাহ করে ক্রমশঃ ধর্ম-গ্রন্থ ক্রয় করতে আরম্ভ করেন এবং কালক্রমে তিনি একটি প্রকান্ড লাইব্রেরী করে ফেলেন। বঙ্গদেশের কোন একজন আলেমের এত বড় একটা লাইব্রেরী আছে বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি সর্বদা গ্রন্থাদি অধ্যয়নে লিপ্ত থাকেন এবং এমনি একাগ্রচিত্তে অধ্যায়ন করতেন যে দেখলে মনে হত যেন তিনি সংসার হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

প্রত্যহ রাত্রি ১১টা পর্যন্ত অধ্যয়ন তার নিত্য অভ্যাস ছিল। দিবসের প্রত্যেক অবসর সময়, এমন কি, স্কুলের বিশ্রাম ঘন্টায় পর্যন্ত তিনি ধর্ম-গ্রন্থাদি অধ্যায়নে নিমগ্ন থাকতেন। এভাবে তাঁর জীবনের একটা প্রধান অংশ তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাটিয়ে দেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর সততা, ন্যায়-পরায়ণতা ও ধর্মনিষ্ঠায় এবং আধ্যাত্মিকতায় হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ে উচ্চ আসন অধিকার করে নিলেন। বিধাতার নিপুণ হস্ত তাঁকে বাঙলায় আহমদীয়াতের বীজ বপন করতে যেভাবে নিযুক্ত করেছিলেন তা মোটামুটি কম বেশী সবারই জানা আছে।

মওলানা সাহেবের ব্যক্তিগত প্রভাব

তদানিন্তন কুমিল্লা জেলার ' ব্রাহ্মণবাড়িয়া' একটি ঐতিহ্যপূর্ণ মহকুমা শহর ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এতদঞ্চলের প্রখ্যাত পীর বংশোদ্ভুত হযরত মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব হিন্দুস্থান থেকে আরবী ও পারসিতে পারদর্শিতা অর্জন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আগমনের পর স্থানীয় বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমানদের পরামর্শে নিজ গ্রামে না যেয়ে এ শহরেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান নেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টের প্রাঙ্গন হতে মাত্র এক ফারলং পশ্চিমে অবস্থিত প্রখ্যাত 'লাখি ভাওয়াল বাড়ীর' দক্ষিণ-পূর্ব পাশে তিনি একটি বাসা খরিদ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। হযরত মৌলানা সাহেব এখানে বসবাস করার পর থেকে শহরের এ অংশে আরো কতিপয় বিশিষ্ট মুসলমান ও হিন্দু এসে বসতিস্থাপন করেন এবং প্রভাবশালী মৌলানা সাহেবের নামে এ পাড়ার নাম হয়ে যায় 'মৌলভীপাড়া'।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিল তদানিন্তন সরাইল পরগণার অন্তর্গত একটি মৌজা। সরাইল এষ্টেট ছিল কাশিম বাজারের (চৌদ্দকুষার) প্রখ্যাত জমিদার রাজকৃষ্ণ রায় বাহাদুরের জমিদারীর অংশবিশেষ। প্রজাদের শিক্ষা-দীক্ষার সুবিধার্থে রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র রাজা অন্নদা রায় বাহাদুর ১৮৭৫ ইং সালে এখানে একটি হাই স্কুল স্থাপন করেন। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে অতিরিক্ত পাঠ্য হিসেবে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আরবী-পারসি এবং হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষার কারিকুলামভুক্ত করা হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য হিন্দু পন্ডিত পাওয়া যেত বটে কিন্তু আরবী-পারসি শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ছিল অতি বিরল। এমনই এক যুগে সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব অন্নদা হাই স্কুলে 'হেড মৌলানা' হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সবাই হযরত মৌলানা সাহেবকে একজন উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তি বলে গণ্য করতেন। এ শহরে এবং শহরটির আশেপাশে মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। হাই স্কুলটিতে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল অনুল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানা পুস্করিনীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ১০/১২ জন মুছল্লির জন্য স্থান সংকুলান হয় এমন একখানা ক্ষুদ্র জীর্ণ মসজিদ ছিল। তাছাড়া দারিদ্র-নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য কোন নামাযের জায়গা বা বসবাসের জন্য কোন একটি দোকান পাটের নাম গন্ধও ছিল না।

বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া 'জামে মসজিদটি' যা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, এরও প্রবর্তা হযরত মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব। তিনি উক্ত মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন। ঈদগাহ্ ময়দানে ঈদের নামাযের ইমামতিও তিনিই করতেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর থেকে তাঁর মুরীদানের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে তিনি জামে মসজিদের ইমামতি ছেড়ে দিলেন ও তাঁর নিজ বসতবাড়ীতে বৈঠকখানা রূপে ব্যবহৃত টিনের ঘরটিকেই মসজিদ এবং মাদ্রাসা হিসেবে চালাতে লাগলেন।

হযরত মৌলানা সাহেবের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন 'লাখি রাজচন্দ্র রায়' নামক এক বিরাট ধনী ব্যক্তি। লাখি রাজচন্দ্র রায় ও তদীয় সহোদর ভ্রাতা চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় হযরত মৌলানা সাহেবের খুবই ভক্ত ছিলেন। সে যুগে 'লক্ষ টাকার' ব্যবসায়ীকে বিরাট ধনী বলে গণ্য করা হতো। এ ধরনের ধনবান ব্যক্তিরা সরকার থেকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে বিভূষিত হতেন আর জনসাধারণ এ ধরনের বাড়ীকে 'লাখিবাড়ী' বলে সম্মান করতেন।

লাখিরাজ চন্দ্র রায় মহাশয় জনহিতকর কাজে অগ্রণী ছিলেন। মৌলানা সাহেবের বাড়ির উত্তর পার্শ্বে এবং লাখি বাড়ির পূর্ব পাশের দু'টি ঘাট পাক্কা করার সময় একদিন মৌলানা সাহেব বাবু রাজচন্দ্র রায় মহাশয়কে উদ্দেশ্যে করে বললেন–"কিহে তুমি তোমার পরিবার বর্গের সুবিধার্থে দু'টো ঘাটই পাক্কা করে ফেলেছ; আমার ভক্তরা যে নামায পড়ার জন্য অজু করতে যায় তখন কাঁচা ঘাটে তাদের অজু করতে কষ্ট হয় কোন কোন দুর্বল লোক পিছলিয়ে পড়ে আহত হয়ে। তুমি কি আমার মসজিদ বরাবর পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের ঘাটটিও পাক্কা করতে পার না?" শুনামাত্রই বাবু রাজচন্দ্র রায় মহাশয় হযরত মৌলানা সাহেবকে আকুণ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে 'আদাপ' জানিয়ে

বললেন, যে –'হুযূর মৌলানা সাহেব, অবশ্যই আমি তা করে দেব' এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রীকে আদেশ করেন ; রাজমিস্ত্রীগণ রায় মহাশয়ের আদেশ প্রাপ্তির পর-মুহূর্ত হতেই কাজ আরম্ভ করেন এবং ক্ষিপ্ততার সাথে কার্য পরিচালনা করে ৩০ ফুট চওড়া করে ৩০/৩৫টি সিড়ি সম্বলিত একটি বিরাট 'পাক্কা ঘাট' নির্মাণ করে দিলেন যা অদ্যাবধি অক্ষুন্ন রয়েছে।

১৯২৬ সনে মৌলানা সাহেবের ইন্তেকালের পর প্রতিবেশি ধনী পরলোকগত ভাওয়াল রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের ৪র্থ ও সর্বকনিষ্ট পুত্র বাবু সুরেন্দ্র রায় (যিনি ১৯৮৩ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন) যৌবনকালে একদিন স্বপ্নে দেখলেন যেন মরহুম হযরত মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব তার সামনে উপস্থিত হয়ে বলছেন–"কিহে সুরেন্দ, আমাদের অজু করার ঘাটটি যে এমনভাবে নোংরা হয়ে রয়েছে তা কি তোমরা দেখ না"?

এ স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন মাঘ মাসের এক শীতের রাতে। সুরেন্দ্র বাবু তদানিন্তন এক প্রখ্যাত ধনকুবের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ভক্তির আতিশয্যে মাঘের এই কণকণে শীতের রাত্রেই শয্যা ত্যাগ করে এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে অশিক্ষিত প্রতিবেশীদের দ্বারা যা-তা ভাবে ব্যবহৃত একেবারে আবর্জনাবৃত দুর্গন্ধময় ঘাটটির প্রতিটি সিড়ি পরিষ্কার করতে লাগলেন। প্রাত:কালে ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গেই যখন প্রতিবেশী মুসলমানরা অজু করতে উপস্থিত হলেন তখন পর্যন্ত সুরেন্দ্র বাবু দ্বারা ঘাটটি পরিষ্কারের কাজ শেষ হয়েছে দেখে সকলেই অবাক। লোকেরা সুরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন–'এ ঘাটটি আপনার পূর্ব পুরুষেরা মুসলমানদেরকে ব্যবহারের জন্য দান করে গেছেন, এমতাবস্থায় এ প্রচন্ড হাড় কাঁপানো শীতের রাতে এত কষ্ট করে ঘাট সাফ করলেন কেন"?

সুরেন্দ্র উপরোক্ত স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে বললেন–'এ মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখে এবং ঘাট পরিষ্কার সম্পর্কে তাঁর উপদেশবাণী স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হিসেবে আমার সব আরাম আয়েস জলাঞ্জলি দিয়ে প্রচন্ড শীত কষ্টকে উপেক্ষা করেই পরিষ্কার করার কাজ আরম্ভ করছি এবং এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধান করে আমি আমার হৃদয়ে এক অনাবিল প্রশান্তি উপলব্ধি করছি।" অত:পর ১৯৮৩ সন পর্যন্ত সুরেন্দ্র রায়ে জীবদ্দশায় প্রত্যহ সকালে ঘাটটি পরিষ্কার করে ফেলাকে তিনি এক নিত্যনৈমত্তিক মহান কর্তব্য হিসেবেই পালন করে গেছেন। বর্তমানে সুরেন্দ্র বাবুর এক উদারমনা ভাতিজা বা বিনোদ রায়ের ছেলে শ্রীমণ বীরেন্দ্র রায় সদা-সর্বদা ঘাটটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে তাঁদের পারিবারিক মহত ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছেন।

তৎকালীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সামাজিক অবস্থা ও প্রেক্ষাপট (বড় মৌলানা সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণ করার পূর্বেকার সামাজিক অবস্থা):

ঐশী পরিকল্পনায় চালিত আল্লাহ্‌র অলী বিশিষ্ট বুযুর্গ আলেম ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে ধর্মশাস্ত্রে অগাধ বুৎপত্তি লাভ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রত্যাবর্তনের পর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যেন এক সূর্য সন্তান মাতৃকোলে ফিরে এসেছেন। কেননা তখন তাঁর সমতুল্য ধর্মীয় জ্ঞানে পান্ডিত্যপূর্ণ আলেম অবিভক্ত বাংলায় ছিল বিরল। সারা ভারতবর্ষে হাতে গোনা মাত্র ক'জন ছিলেন। তাই এ ধর্মগুরু দর্শন ও দোয়া লাভে এবং তাঁর পান্ডিত্য হতে জ্ঞান আহরণে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা ছুটে আসেন। শহরের মুসলমান-হিন্দু সকল ধর্মাবলম্বী তাঁর প্রতি ভক্তিতে শ্রদ্ধাবনত হন এবং এ শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞান ভান্ডারকে কাছে ধরে রাখতে তাঁকে নিজ গ্রামে না গিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে বসবাসের অনুরোধ জানান। ফলে তিনি শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মধ্যপাড়ায় জমি ক্রয় করে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন এবং এক ধর্মপ্রাণ আত্মীয় মহিলাকে বিয়ে করে জীবন শুরু করেন। মওলানা সাহেব তখন ধর্মের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন এবং ইসলামের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে জড়িত হন। এতদঞ্চলের মুসলমান ছেলেদের ধর্মীয় শিক্ষাদানে নিজ বাড়ীর কিয়দংশে প্রতিষ্ঠা করেন এক আধুনিক মাদ্রাসা। এ বিদ্যাপীঠ থেকে জ্ঞান তাপসের পরশে বহু পন্ডিত ও আলেম বের হন। শহরের থানার পার্শ্বে পুকুর পাড়ে দশ/বার জন মুসল্লির নামায পড়ার জন্য নির্মিত ছোট মসজিদটি অনেক বর্ধিত ও সংস্কার করে তিনি এক বিরাট জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনিই হন এ মসজিদের ইমাম ও খতীব। সরকার তাঁকে ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার কাজী ও মুফতি পদেও নিয়োগ প্রদান করে। উপরন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাযের ইমামতীর দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। এক কথায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের সকল বড়-বড় ধর্মীয় কর্মকান্ডের প্রাণপুরুষ, অগ্রপথিক ও পথিকৃৎ হন মৌলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব।

তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশি ছিল। শহরের আনন্দ বাজারের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ বাবু, জগৎ বাজারের প্রতিষ্ঠাতা জগৎবাবু এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ ঐতিহ্যবাহী মহাদেব পট্টীর প্রখ্যাত মিষ্টি প্রস্তুতকারক মহাদেবসহ বিভিন্ন হিন্দু বিত্তশালী ব্যক্তিরা ছিলেন শহরের কর্ণধার। কিন্তুমৌলানা ওয়াহেদ সাহেবের আবির্ভাব এবং শহরে বড় মসজিদ নির্মাণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকান্ড বিস্তার লাভে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। তিনি একজন ধর্মগুরু ঋষিকল্প পুরুষ হিসেবে সুপরিচিত হন। আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ায় বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা তাদের সংকট নিরসনে তাঁর কাছে দোয়ার আরজ করতেন। ফলে তখন তাঁর মাধ্যমে হিন্দু অধ্যুষিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। 'বড় মৌলানা' বলে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। আঞ্চলিক ভাষায় 'বাওন বাইড়ার বড় মৌলানা' বলে তাঁর পরিচিত বিস্তৃত হয়। তাছাড়া তাঁর আবাসনের স্থান মধ্যপাড়ার কিয়দংশকে সকলে স্বত:স্ফুর্তভাবে নামকরণ করেন 'মৌলভীপাড়া'। এ মৌলভীপাড়ার বড় মৌলানা কথা শতবর্ষ ধরে আজও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে কিংবদন্তি হয়ে আছে।

১৯১২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটিতে আহমদীয়াতের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পরিস্ফুটিত ও ফুলে ফলে সুরভিত হয় ১৯১৩ সালে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ' ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া' গঠনের মাধ্যমে। এ নবগঠিত জামাতের প্রেসিডেন্ট হন মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব। তিনি প্রথমে বাঙালি মোবেল্লগও ছিলেন।

কিন্তু 'শুরুতেই প্রচন্ড বিরোধিতা শুরু হয়। যারা তাঁকে কাদিয়ান গিয়ে সরেজমিনে যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি সত্যতা উপলব্ধি করে বয়আত গ্রহণ করে আসলে তারাও গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাদের রূপ পাল্টে যায়। চারদিকে বিরোধিতার আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু ধর্ম জগতের ইতিহাস বিরোধিতায় সফলতা আসে, নিপীড়নেই জাগরণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা মোখালেফাতের ঝড় তুলে। ঝড় আসলে উঁচু গাছে যেমন ঝড়ের বেগ বেশী লাগে তেমনি বড় মৌলানা ওপর প্রবলভাবে মোখালেফাত আসে। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ ও

তাঁর রাসূলের শিক্ষা অনুসারে ঈমানের পরীক্ষায় দূর্ভেদ্য প্রাচীর স্বরূপ অবিচল থাকেন। পার্থিব জীবনের বিরোধিতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং সতীর্থদের অভয়বাণী শোনান।

শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মৌলানা সাহেবকে আহমদীয়া মতবাদ থেকে ফিরিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। একদা পৈরতলা গ্রামের আব্বাস খাঁ শহরের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মৌলানা সাহেবের বাড়িতে যান এবং তাকে পার্থিব বিভিন্ন ধন সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির লোভ দেখিয়ে নতুন আকিদা পরিত্যাগের অনুরোধ জানান। ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষায় আদর্শন্বিত মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব তাদেরকে উত্তরে বলেন–

.....এ নশ্বর জীবনে পার্থিব লালসায় আকৃষ্ট হয়ে কোন অবস্থাতেই সত্যকে পরিত্যাগ করতে পারবো না। এমনকি এ সত্যের পথে প্রাণ বিসর্জন দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবো না। উত্তর শুনে তারা নিরাশ হয়ে চলে যান এবং মহল্লায় মহল্লায় অনবরত সভা-সমিতি করে মৌলানা সাহেব ও তাঁর সহচর আহমদীদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে বয়কটের ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন।..... বয়কট যখন পুরোদমে চলছিল তখন মৌলভী সাহেবরা জনসাধারণকে আদেশ দিলেন, বড় মৌলানা সাহেব ও তাঁর সকল শিষ্যদের সাথে সালাম-কালাম, বেচা-কেনা, লেন-দেন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ.....।

শত বিরোধিতার মাঝেও বঙ্গীয় আমীর মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব তাঁর পান্ডিত্যের প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও ঐশী প্রেরণায় বীরত্ব ও বিচক্ষণতার সাথে নিরলস তবলীগ করেছেন, যারা মোখালেফাত বা বয়কটের সম্মুখীন হয়েছেন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, দোয়া করেছেন, অভয় দিয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। সবার অতি আপনজন মুরুব্বী ও অভিভাবক ছিলেন তিনি।

[তথ্য সূত্র সৌজন্যে: (১) 'পাক্ষিক আহ্‌মদী' (২) আল্লামা জিল্লুর রহমান লিখিত ১৯২৬ সালে 'আল হেদায়েত' পত্রিকায় প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী'র আলোকে/ অংশবিশেষ (৩) মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব কর্তৃক ১৯৮৬ ইং সালে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত 'জজবাতুল হক' পুস্তকের অনুবাদ (২য় সংস্করণ) এবং (৪) 'আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব' লেখক জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল।]

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন: "আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

সত্যের বিজয়

মাহমুদ আহমদ সুমন

২০০৩ সালের মে মাসের কথা। আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্রগ্রাম থেকে অধমকে পাঠানো হয়েছিল রাঙ্গামাটি জেলার বাগাইছড়ি থানার মাহিল্লাহ গ্রামে। অধমের সফর সঙ্গী হিসেবে আরো দু'জন ছিলেন, তারা হলেন চট্রগ্রামের জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব এবং জনাব আনোয়ার হোসেন সাহেব। আমাদেরকে পাঠানোর কারণ হলো মাহিল্লাহ গ্রামে বেশ কিছু মানুষ আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বয়আত গ্রহণ করেছেন তাদের তালিম-তরবীয়ত ও জুমুআ পড়ানোর জন্য। আমরা ৯ মে ২০০৩ইং বৃহস্পতিবার চট্রগ্রাম থেকে মাহিল্লাহর উদ্দেশ্যে রৌনা হই। পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে মাহিল্লাহ পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। মাহিল্লাহর বেশ কয়েকজন আহমদী সদস্যদের সাথে রাতেই যোগাযোগ করা হয়।

শুরুর দিকে আহমদীদের নিজস্ব কোন মসজিদ ছিল না। সবাই তাদের পূর্বের যে মসজিদ এ মসজিদেই নামাজ আদায় করে থাকেন। কিন্তু যখন মসজিদের আশে-পাশের প্রায় সবাই আহমদী হয়ে যান তখন তারা আর পূর্বের ইমামের পিছনে নামাজ আদায় না করার ফলে (যেহেতু সেই ইমাম আহমদীয়াতের দীক্ষা নেননি) সেই ইমাম এই মসজিদ থেকে চলে যায়। আর তখন থেকে আহমদীরা নিজেরাই এ মসজিদটিতে নামাজ আদায় করে যাচ্ছিল।

অধম এ মসজিদেই ১০ মে, জুমুআর নামাজ পড়াই। মনে হয় ওয়াকফে জাদীদ মোয়াল্লেম হিসেবে অধমই মাহিল্লাহতে প্রথম জুমুআর নামাজ পড়াই, আলহামদুলিল্লাহ। সে দিনের জুমুআতে মসজিদ প্রায় ভর্তি ছিল। মুসল্লিদের মাঝে অনেক অ-আহমদীও ছিলেন। নতুন ইমামের পিছনে নামাজ আদায় শেষে অনেকে অনেক ধরণের প্রশ্ন করা শুরু করে। যেমন জুমুআর খুতবা বাংলায় কেন দিলেন, ইমাম সাহেবের দাড়ী ছোট কেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এদিকে এই মসজিদের পূর্বের ইমাম যিনি ছিলেন তিনি মাইনি বাজারের মাদ্রাসাগুলোতে খবর দেয় যে, মাহিল্লাহর লোকেরা কাদিয়ানী হয়েগেছে, তারা এখন আর আমার পিছনে নামাজ আদায় করতে চায় না। তারা চট্রগ্রাম থেকে ইমাম আনিয়ে নামাজ আদায় করা শুরু করেছে। এই কথা শুনে মাদ্রাসার মোল্লারা মাইনি বাজার আর্মি ক্যাম্পে বিচার দেয় যে, আমাদের মুসলমান লোকদের জোড় করে কাদিয়ানী বানাচ্ছেন চট্রগ্রামের লোকেরা। তারা চট্রগ্রাম থেকে এসে আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে আসলে খৃষ্টান বানাচ্ছেন। এতে আমাদের গ্রামে বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে এবং পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে, আপনারা যদি সেই তিন কাদিয়ানীকে বিচার না করেন তাহলে আমরাই তাদের উচিৎ শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।

মোল্লাদের অভিযোগ অনুযায়ী শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে দু'জন আর্মি ফোর্স আমাদেরকে এসে বললেন, যে তিন কাদিয়ানী চট্রগ্রাম থেকে এসেছে তারা যেন আগামীকাল শনিবার সকাল ৯টায় মাইনি বাজার আর্মি ক্যাম্পে ক্যাম্প কমান্ডার সাহেবের সাথে দেখা করতে যান। দেখা না করে যেন কেউ রাঙ্গামাটি ত্যাগ না করে।

আমাদের তিন জনের মধ্যে এক জন শনিবার ভোরেই চট্রগ্রাম চলে যাওয়ার কথা। আমরা ভাবলাম, ভোরেই যেহেতু একজন চলে যাবেন তাই আগামীকাল দেখা না করে আজই দেখা করে আসি। আমরা তিন জন আর কয়েকজন স্থানীয় আহমদীসহ বিকালের দিকে মাইনি বাজার আর্মি ক্যাম্পে গেলাম কমান্ডার সাহেব-এর সাথে দেখা করার জন্য। আমরা যখন ক্যাম্পে পৌঁছলাম, ক্যাম্প কমান্ডার সাহেব আমাদের সামনে এসে খুবই রাগান্বিতভাবে বললেন, আজ কেন আসলেন, আগামী কাল যে সময়ে আসার কথা ঠিক সে সময়েই আসতে হবে। আমরা বললাম, আমাদের একজন ভোরে চলে যাবেন তাই আগেই আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি, এই কথা শুনে তিনি আরো রেগে বললেন, আমার অনুমতি ছাড়া কেউ চট্রগ্রাম যেতে পারবে না। কি আর করার, আমরা ছালাম জানিয়ে চলে আসলাম।

মসজিদে চাটাই বিছিয়ে তিন জন শুয়ে শুয়ে ভাবছি আগামীকাল কি হবে। তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করলাম, মহান খোদা তা'লার কাছে বিনীতভাবে দোয়া করলাম। হে খোদা! তুমি এই কমান্ডার সাহেবের হৃদয়কে কিছুটা নরম করে দাও, আর হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা বুঝার তাকে মনমানসিকতা দান কর।

পরের দিন ৯টা বাজার পূর্বেই আমরা তিনজন আর সাথে জনাব আইনাল হক, জনাব কবির আহমদ সরদার, মাহিল্লাহর বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব রিয়াজ উদ্দিন ফকিরসহ আরো কয়েক জন স্থানীয় আহমদী মিলে মাইনি বাজার ক্যাম্পে উপস্থিত হই। আমাদের সবাইকে অধম বলে দিলাম, অধম যখন কথা বলবো, তখন আপনারা সবাই দোয়া করবেন, কোন কথা বলবেন না, যা বলার অধমই বলবো। আমাদের যাওয়ার পর পরই বিভিন্ন দিক থেকে দলে দলে প্রায় কয়েক শ' মানুষ এসে জমা হতে থাকে। মোল্লার দলও বড় বড় কিতাব নিয়ে হাজির, কারো কারো হাতে লাঠিও দেখা যাচ্ছে। গ্রামের অনেকেই এসেছেন কাদিয়ানী দেখতে কেমন, তারা কি সাধারণ মানুষের মত না অন্য রকম। আবার অনেকে এসেছেন কাদিয়ানীদের মেরে পিটে নদীতে ভাসীয়ে দেয়া হবে তা দেখতে। আসলে কমান্ডার সাহেবই মোল্লাদের খবর দিয়ে রেখেছিলেন আসার জন্য।

আমাদেরকে বসতে দিলেন, চার পাশে শত শত উৎসুক জনতার ভির। আমরা এক পাশে বসলাম, অন্য দিকে মোল্লার দল বসলো, আরেক পাশে কমান্ডার সাহেব বসলেন, চার পাশে অনেক আর্মি ফোর্সও দাঁড়িয়ে আছে। একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলো মোল্লার

দল, অধম কুরআন হাদীসের আলোকে উত্তর দিচ্ছি কিন্তু মোল্লারা কোন কথা না শুনে হৈ চৈ করে আর বলে উঠে এদের সব কথাই মিথ্যা। কমান্ডার সাহেবকে তারা বলেন, স্যার কাদিয়ানীরা কাফের, তাদের কোন কথা শুনবেন না, কাফেরকে হত্যা করলে আমাদের ছোয়াব হবে, আপনারা বিচার না করতে পারলে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ইতিমধ্যে মোল্লারা ব্যাপক হৈ হুল্লো শুরু করে দিল। পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমার কোন কথাই তারা শুনতে চাচ্ছে না।

আল্লাহ্ তা'লা অধমের কণ্ঠ থেকে হঠাৎ একটি আওয়াজ বের করলেন, আমি বললাম, কমান্ডার সাহেব! আপনি আমাকে কম পক্ষে ১০ মিনিট সময় দিন। আমি কি বিশ্বাস করি তা শুনাতে চাই। আমার বক্তব্যের পর আপনি যদি মনে করেন আমি কাফের আর এখানে বিশৃংখলা করার জন্য আমরা এসেছি তাহলে যে শাস্তি আপনারা আমাদের দিবেন তা মাথা পেতে নিব।

একথা শুনে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনি ভাল কথা বলেছেন, এখন আমরা একটা ফয়সালায় আসতে পারবো। তিনি সবাইকে চুপ করে থাকতে বললেন আর আমাকে বললেন আমার বক্তব্য শুরু করতে। মহান খোদার উপর ভরসা করে অধম দাঁড়ালাম, অধমের হাতে আহমদীয়া জামাতের কয়েকটি বই ছিলো। এর মধ্যে থেকে আমাদের ধর্ম বিশ্বাস যা হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আইয়ামুস সুলেহ পুস্তকে উল্লেখ করেছেন তা সবার সামনে জোরে জোরে পাঠ করে শুনালাম। শেষে বললাম, এই হচ্ছে আমাদের ধর্ম বিশ্বাস, এই হচ্ছে আমাদের কলেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'**। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, ৩০ পারা কুরআনের প্রতিটি অক্ষরকে মান্য করি। এখন আপনি বলুন, আমরা কি মুসলমান না অমুসলমান? যদি আমরা অমুসলমান হয়ে থাকি তাহলে এই মোল্লারা আমাদের মুসলমান বানাক, তাদের কাছে কোন কলেমা আছে যা মান্য করলে মুসলমান হওয়া যায়।

অধম যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর লেখা থেকে পড়ছিলাম তখন মনে হলো কমান্ডার সাহেব-এর হৃদয় নরম হতে লাগলো। বক্তব্য শেষেই কমান্ডার সাহেব বলে উঠলেন, আপনরা ৯৯% মুসলমান। আপনারা মুসলমান না হলে আর কারা মুসলমান। তবে আপনারা যাকে ইমাম মাহদী বলছেন তিনি ইমাম মাহদী কি না এটা আমার যাচাই করার প্রয়োজন আছে। তবে এটা ঠিক আপনারা ভালো মুসলমান। তিনি দাঁড়িয়ে সকলের মাঝে ঘোষণা দিলেন এরা মুসলমান। এদেরকে যদি কেউ কিছু করে তাহলে আমি পুরো গ্রাম ধরে নিয়ে আসবো। আর সবাইকে বলে দিলেন, আগামীকাল এরা চট্রগ্রাম চলে যাবে, তাদের যেন কোন ধরণের সমস্যা না হয়। সবাইকে যার কাজে চলে যেতে বললেন। শেষে কমান্ডার সাহেব আমাদের সাথে করমর্দন ও কোলাকুলি করে সম্মানের সাথে বিদায় দিলেন। তিনি এটাও বলেন, আমি আপনাদের চট্রগ্রাম মসজিদে যাব।

আল্লাহ্ তাআলা সত্যের বিজয় কিভাবে দিলেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি সে সময়। অধমের মত দূর্বল এক সামান্য খাদেমের মাধ্যমে এতো বড় বড় আলেমদের পরাজিত করালেন যা মনে হলে খোদা তাআলার প্রতি বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর কমান্ডার সাহেব-এর হৃদয়কে এতো নরম করে দিলেন যে প্রথম দিনের আচরণ আর ঘটনার দিনের আচরণের মধ্যে যেন রাত দিন পার্থক্য, মনে হলো ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা এনে বসিয়েছেন। এ সব কিছুই ছিলো মহান খোদার অশেষ মেহেরবাণী।

মাহিল্লাহ-তে আহমদীয়াতের অনেক উন্নতি হোক এই দোয়াই করি সেই সাথে সে দিন যারা অধমের সাথে ছিলেন তাদেরকেও খোদা তাআলা বিশেষ প্রতিদান দান করুন, আমীন।

লেখক: মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ
masumon83@yahoo.com

শুভ বিবাহ

গত ০৪/০৯/২০১১ মোছা: তানজিলা আক্তার ময়না, পিতা-মোহাম্মদ তাজউদ্দিন, শালশিড়ি, পঞ্চগড় এর সাথে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা শহীদ আহমদ, আহমদনগর, পঞ্চগড় এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯৩৯/২০১১

গত ১৯/০৮/২০১১ মোছা: মেহ্‌নাজ হাফিজ মেরিনা, পিতা-প্রকৌশলি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, নারায়ণখোলা, শেরপুর এর সাথে মারুফ রানা, পিতা-মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ, রানা ভিলা, আকুয়া দক্ষিণপাড়া, ময়মনসিংহ এর বিবাহ ৫০,০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯৪০/২০১১

গত ২৫/১১/২০১১ মোছা: সাদিয়া নাসরিন সম্পা, পিতা-আব্দুল আওয়াল, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে নিজাম উদ্দিন পিন্টু, পিতা-মরহুম ফিরোজ আহমদ, ফিরোজা ভবন, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী এর বিবাহ ৪,০০,০০১/- (চার লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯৪১/২০১১

গত ২৫/১১/২০১১ মোছা: শিরিন আকতার তানিয়া, পিতা-তসদিক আহমদ ভূইয়া ৩৭৩/১ বি-উত্তর পীরের বাগ, মিরপুর, ঢাকা এর সাথে শাহাজাদা ইমরান হানিফ, পিতা-মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন মিঞা ৫/৫ বকসী বাজার লেন এর বিবাহ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯৪২/২০১১

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

এবারের পাঠক কলামের বিষয় **"যুগ খলীফার জুমুআর খুতবা সরাসরি শ্রবণ করার গুরুত্ব"**

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।

লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ জানুয়ারী ২০১২-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সত্যিকার দাবীকারকের মাপকাঠি

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

সুধী পাঠক! আপনারা হয়ত দেখে থাকবেন আজকাল বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলগুলোতে মাঝে মধ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ও তাঁর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'ত তথা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে মিথ্যা আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় এই জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে মিথ্যা দাবীকারক এবং ভন্ড ইমাম মাহ্‌দী বলে বিষোদগার করা হয়ে থাকে। এমনকি তার অনুসারীদের প্রতিও মনগড়া ফতওয়া দিয়ে অত্যাচারের পথ খুলে দেয়। এর কোনটিই ইসলাম সমর্থিত নয়। যুগে যুগে আগমনকারী নবী রাসূলগণের প্রতিও সমসাময়িক আলেম ওলামা ও নেতৃত্ব দানকারী গোষ্ঠীসমূহ আল্লাহ্‌র এই প্রতিনিধিদের ও তাদের মান্যকারীদের উপর যুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন করত। ইতিহাস এগুলো সাক্ষী তাই হতভাগা মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কোন ধান্দাবাজ ও ভন্ডামির জামাত নয়। এ সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ইমাম ও খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ইং জুমুআর খুতবাতে বলেন যে, প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্ যখনই তার প্রেরিতজনকে পাঠান বিরোধীরা এই অপচেষ্টাই করে। কিন্তু তার পরই আল্লাহ্‌র তকদীর বা সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রকাশ পায় এবং তার তকদীরই সদা জয়যুক্ত হয়। সত্যকে আল্লাহ্‌র তকদীর অবশ্যই জয়যুক্ত করবে। এজন্যই যুগে যুগে আল্লাহ্‌র নবীদের আবির্ভূত করেন। যখন মিথ্যা চরম পর্যায়ে পৌঁছে, যখন বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য চরম রূপ ধারণ করে, সত্যের বিলুপ্তি ঘটে, তখন আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ আগমন করেন। নবীগণ আসেন যারা সত্যকে পৃথিবীতে পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন। তারা বিরোধিতা সত্ত্বেও সত্যের প্রচার করেন এবং অগ্রসর হতে থাকেন। তাদের রাস্তায় শত্রুরা লক্ষ লক্ষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু তারপরও আল্লাহ্‌র তকদীরই বিজয় লাভ করে। আল্লাহর তকদীর বা সিদ্ধান্ত নবীদের পক্ষে থাকে, প্রেরিতগণের পক্ষে থাকে, তাঁদের সাহায্য করে থাকে।

বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথেও এটিই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্‌র নিজ অনুগ্রহে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে চলছেন। তারা জলসা করে, মিছিল বের করে, অত্যাচার করে। এবার ৭ সেপ্টেম্বরের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানে অনেক জলসা হয়েছে; রাবওয়ায়ও জলসা হলো; তাদের বড় বড় আলেমরা, শীর্ষস্থানীয় আলেমরা সেখানে যায় এবং গিয়েছে আর জলসার নাম দেয়া হয় 'তাজদারে খতমে নবুওয়াত কনফারেন্স' কিন্তু সেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে গালমন্দ করা বা জামা'তের বিরুদ্ধে বিষোধগার করা ছাড়া আর কিছু হয় না। সারারাত এভাবেই অপলাপ করতে থাকে আর এসব কিছু আল্লাহ্ ও রাসূলের নামে। যাহোক, এই হলো তাদের অবস্থা।

হুযূর (আই.) আরো বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনের দিকে লক্ষ করলে দেখবো, সে যুগের কাফিররাও তাকে 'সাদুক' এবং 'আমীন' নামে আখ্যায়িত করত। এটি তার বিরল সততারই প্রভাব ছিল। যার ফলশ্রুতিতে তিনি যখন তার নিকটাত্মীয় ও মক্কার নেতাদের একত্র করে বলেছিলেন, আমি যদি তোমাদের বলি এই টিলার পিছনে এমন একটি সেনা দল লুকিয়ে আছে যা তোমরা দেখতে পারছোনা–তোমারা কি আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? বাহ্যত: এটি এক অসম্ভব বিষয় ছিল। এর আড়ালে সেনাদল জড়ো হয়ে থাকলে দেখতে না পাবার কোন কারণ ছিল না।

কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা সবাই সমস্বরে বলেছিল, হে মুহাম্মদ (সা.) তুমি কখনো মিথ্য বলনি, তাই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করবো। এরপর তিনি (সা.) তাদেরকে তবলীগ করলেন। কিন্তু এরা জগৎমুখী মানুষ ছিল, পাথরের মত কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিল। তাই এদের মনে তাঁর কথা রেখাপাত করেনি। এদের পরিনামও মন্দ হয়েছিল। এদের কিছু সংখ্যক পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিল।

মোটকথা, নবী রাসূলগণ নিজেদের সত্যতার বলেই জগৎবাসীকে নিজেদের দিকে আহ্বান ও আকৃষ্ট করেন। পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.) তবলীগের উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর মুখনি:সৃত শব্দগুলো বর্ণনা করে বলে, অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে একটি দীর্ঘজীবন কাটিয়েছি তবুও কি তোমরা বুদ্ধি খঁটাবে না? (সূরা ইউনুস : ১৭)

এটি সেই যুক্তি। যা তিনি (সা.) নিজ নবুওয়াতের সত্যতা ও খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হবার স্বপক্ষে প্রদান করেন। আর তা হলো আমি তোমাদের মাঝেই একটি জীবন পার করে এসেছি কিন্তু কখনো মিথ্যা বলিনি। এখন আমি যখন বাধ্যক্যে উপনীত হতে চলেছি, এখন কি আমি মিথ্যা বলতে পারি? আবার তাও খোদার বিরুদ্ধে? সেই খোদার বিরুদ্ধে যিনি মিথ্যাচারকে শির্‌ক বা অংশীবাদিতার সমকক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন? এই কথাটি আমারই আনা শিক্ষার মাঝে নিহিত রয়েছে। আমার আগমনের উদ্দেশ্যই হলো, তওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা এই ছিল মহানবী (সা.)-এর উত্তর।

অতএব নবী রাসূলদের তবলীগের একটি মোক্ষম অস্ত্র ও পদ্ধতি হলো, তাদের সততা ও সত্যবাদীতার দাবী। তাঁদের জীবনে প্রতিটি আঙ্গীকে সততা ও সত্যবাদীতার ঝলক দেখা যায় যার বরাতে তারা তাদের তবলীগ পরিচালনা করেন এবং সত্যের বাণী পৌঁছে থাকেন। এ যুগেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছিল। অর্থাৎ আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে এসেছি। তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি নেই? এ প্রসঙ্গে নুযুলূল মসীহ্ পুস্তকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন :

১৮৮২-এর দিকে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে উক্ত ওহী দ্বারা সম্মানিত করেন এতে অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত খোদা এদিকে ইঙ্গিত

করেছিলেন যে, কোন বিরুদ্ধবাদী তোমার জীবনীতে কোন ধরনের কালিমা লেপন করতে সক্ষম হবে না। অতএব সত্যবাদীতা এমন এক বিষয় যা নবীর সত্যতা প্রমাণ এবং তবলীগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীর এই দাবীকে আমি এক দীর্ঘ জীবন তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি, কখনো মিথ্যা বলিনি, আর এখন বলবো। একথাকে তিনি তাঁর প্রিয়জনের একটি বিশেষ ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কিত এ উদ্ধৃতি নিশ্চয় আপনারা পড়ে থাকবেন ও শুনে থাকবেন। যেখানে কোন শত্রুও তিনি (আ.)-এর জীবনীতে কলঙ্কিত করতে পারে নাই সেখানে সত্যবাদিতা যা জীবন চরিতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য সেক্ষেত্রে কিভাবে বলা যায় যে নাউযুবিল্লাহ্ তিনি (আ.) মিথ্যাবাদী।

অতএব বর্তমান যুগের মৌলবীরা অথবা আপত্তিকারীরা যা ইচ্ছা বলতে থাক। (তাতে কি আসে যায়)। হ্যাঁ, তারা বকবক করে কিন্তু কোন কিছুই প্রমান করতে পারে নাই আজো যারা নিষ্ঠাবান এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তাআলার কাছে হেদায়াত ও সাহায্য চায় আল্লাহ্ তাআলা তাদের সামনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সামনে সত্যতা প্রকাশ করে দেন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময় নিয়েও অনেকে অনেক ধরনের মন্তব্য করে থাকে তার (আ.)-এর আগমনের প্রকৃত সময় সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীস হতে কি জানা যায় তা পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিম্নে বর্ণনা করছি।

ক) পবিত্র কুরআনের সূরা সিজদার আয়াত নং ৬-এ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তিনি (আল্লাহ্) আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে কুরআনী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তারপর সেটা তার (আল্লাহ্‌র) দিকে একদিনে উঠে যাবে, যে দিনটি তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর"।

খ) মহানবী (সা.) বলেন, "আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর এর সন্নিহিতগণ, এর সন্নিহিতগণ, তারপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাবা ঘটবে" (নিসাই ও মিশকাত)

গ) মহানবী (সা.) আরো বলেন, "ইমাম মাহ্‌দী সম্পকিত লক্ষনগুলো সে ২ শত বছর পরে দেখা দিবে যা হাজার বছর পরে আসবে" (মিশকাত)। উপরে উল্লেখিত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসগুলো দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রথম ৩ শত বছর এর প্রতিষ্ঠার যুগ। তারপর যদিও প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে মোজাদ্দিদ আগমন করবেন, তথাপি পরবর্তী এক হাজার বছরে শরীয়ত আল্লাহ্‌র দিকে উঠে যাবে। এ হিসেবে রাসূল (সা.) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ইসলামের চরম অধ:পতন ঘটবে এবং সে সময়টি হচ্ছে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের সময়। যে বিষয়ে ওলীআল্লাহ্‌গণও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের সময় হিসেবে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুকেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন এবং যথা সময়ে অর্থাৎ হিজর ১৩০৬ সনে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তার দাবী পেশ করেন, যার পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। হুজাজুল কেরামা গ্রন্থের ৩৫৬ পৃষ্ঠা লিখা আছে যে, ইমাম মাহ্‌দীর নাম 'আহমদ' হবে।

ঘ) হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদের মাহ্‌দীর সুসংবাদ দিচ্ছি। তিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সময় আগমন করবেন, যখন মানুষের মধ্যে মতবিরোধ চরম আকার ধারন করবে এবং এবং বহু ভূমিকম্প হবে। (নাজমুস সাকিব ২য় খন্ড পৃ: ১১)। যেমন শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী, মালেকী, হাম্বলী, বেরেলভী, দেওবন্দী, ওয়াহাবী, লামাযহাবী, চিশতিয়া চরমোনাই, কাদেরিয়া ইত্যাদি দলে উপদলে মুসলমানরা বিভক্ত হয়েছে।

ঙ) হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ এর কিতাবুল মাহ্‌দী অংশে উল্লেখ রয়েছে যে, মাহ্‌দী (আ.) নদী অববাহিকার স্থান থেকে আবির্ভূত হবেন এবং তিনি বড় জমিদার বংশীয় হবেন। বিপাশা নদী থেকে ৯ মাইল দূরে কাদিয়ানের অবস্থান। যেখানে আহমদ (আ.) জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি বড় জমিদার বংশীয় ছিলেন। অন্য এক গ্রন্থ 'জাওয়াহেরুল আসরার" এর ৫৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে মাহদী (আ.) কাদিয়ান নামক গ্রাম থেকে আবির্ভূত হবেন। ভাষা ভেদে শব্দের উচ্চারণে তারতম্য হয়। 'কাদেয়া' নির্দেশ করে। যেখানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) জন্মগ্রহণ করেন।

চ) সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "মাহ্‌দী (আ.) এমন এক সময় আসবেন, যখন ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে, আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বেড়ে যাবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, পুণ্য কাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে, ঝগড়া বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারা-মারি, কাটা-কাটি বেশি হবে, ব্যবসায়ীরা ঈমানশূন্য হবে ভূমিকম্প বেশি হবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় দালান তৈরী করে গর্ব অনুভব করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন হবে, দলের সর্দার ফাসেক হবে, জাতির নীচ প্রকৃতির লোক তাদের নেতা হবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রধান্য হবে, উট বেকার হবে, তাতে চড়ে মানুষ দূর দেশে যাতায়াত করবে না।" এসব লক্ষণের পূর্ণতার বিষয়ে আলোচনার কোনই অবকাশ নেই। কারণ মানুষ খুব সহজেই এসবের পূর্ণতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে। অতএব হযরত মির্যা সাহেব একজন সত্য মাহ্‌দী এতে কোন সন্দেহ নেই।

সত্যিকার অর্থে একজন সত্যবাদী সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট বলে মনে করি। শুধু শুধু বিরোধিতা না করে সত্যকে বুঝার ও মানার চেষ্টা থাকা উচিত। যুগের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। যারা এখনো ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের অপেক্ষায় আছেন তাদের উচিত সত্যিকার দাবীকারকের খোজখবর নেওয়া। আজ আহমদীয়া জামাত এ দাবী করে যে, ইমাম মাহ্‌দী এসে গেছে এবং ১২৩ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাই এ জামাতের সাথে যোগাযোগ করুন ও সত্যিকার মাহ্‌দীর সংবাদ নিন আহমদীয়াতের ভুবনে সবাইকে স্বাগতম জানাই। মহান আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে সত্যকে বুঝা এবং মানার তৌফিক দান করুন, আমীন।

লেখক: মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা

ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে পাক্ষিক আহমদীর সকল পাঠকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক অনেক অনেক কল্যাণ ও শান্তি।

সম্পাদক

প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সত্যতায় হাজারো নিদর্শন

মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু

(২য় কিস্তি)

৪৩নং নিদর্শন : আমার পুস্তক কিশতিয়ে নূহ্‌তে প্লেগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছি, টিকা না নেওয়া সম্পর্কেও আমার অনুসারীদেরকে বলা হয়েছে, কিন্তু আমার অনুসারীরা মারা যাবে না। তাও আল্লাহ্ পুরা করলেন।

৪৪নং নিদর্শন : মালীর কোটলার জমিদার সরদার নবাব মুহাম্মদ আলীর পুত্র ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত ছিল, দোয়া করলাম আল্লাহ্ তাকে সুস্থ করলেন।

৪৫নং নিদর্শন : আমার বন্ধু মৌলভী নূরুদ্দীন এর পুত্র মারা গেলে বিরুদ্ধবাদীরা হৈ চৈ করতে থাকে এই বলে যে অপুত্রক, আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি, পরে এক পুত্র সন্তান জন্ম হয় তার নাম রাখা হয় আব্দুল হাই। এই ঘটনা সকলে জানে।

৪৬নং নিদর্শন : তখন সারা পঞ্জাবে কোন প্লেগ ছিল না, আল্লাহ্ আমাকে বলেন, 'তুমি লোকদের জানাও সারা পাঞ্জাবে প্লেগ আক্রমণ হবে তোমার সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ তাই হল, সারা পাঞ্জাবে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ মারা গেল।

৪৭নং নিদর্শন : জম্মুর চেরাগদীন নামে এক ব্যক্তি আমার বয়আত করেন পরে মুরতাদ হন আর আমাকে গালি দিতে থাকে আর বলে আল্লাহ্ আমাকে আশা দিয়েছে দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য মির্যা সাহেবকে হত্যা করবো এই লাঠি দ্বারা। সে ১৯০৬ সালের ৪ এপ্রিল দুই পুত্র সহ প্লেগে ধ্বংস হয়ে মারা গেল, আল্লাহ্ আমাকে পূর্বেই জানিয়েছিলেন আমি সকলকে তা জানাই।

৪৮নং নিদর্শন : মির্যা আহমদ বেগ হুশিয়ারপুরী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী যে সে ৩ বৎসরের মধ্যে মারা যাবে, তাই হল ৩ বৎসরের মধ্যে মারা গেল।

৪৯নং নিদর্শন : ভূমিকম্প সম্পর্কে আল্লাহ্ আমাকে জানাতে বলেন, আমি জানাই পরে ১৯০৫ সনের ৪ এপ্রিলে ভূমিকম্প আঘাত হানলো এবং পাঞ্জাবকে তসনস করে ছিল। আমার এ এলাকাকে সুরক্ষা করলেন।

৫০ নং নিদর্শন : আর একটি ভূমিকম্প সম্পর্কে, ১৯০৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারীতে ভূমিকম্প আসল এবং পাহাড়ী এলাকাতে অনেক জান মালের ক্ষতি হল।

৫১ নং নিদর্শন : আল্লাহ্ আবার জানালেন এখন ক্রমাগত ভূকিমম্প আসতেই থাকবে, এইভাবে ৫ম ভূমিকম্প কেয়ামত তুল্য হবে তাই হল এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সকলেই অবগত।

৫২ নং নিদর্শন : পন্ডিত দয়ানন্দ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, সে সীমা অতিরিক্ত দুষ্টামি করেছিল, ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হল, সে মারা যাবে, সেই বৎসরই মারা গেল সকলেই অবগত।

৫৩ নং নিদর্শন : বিশ্বম্বর দাস নামে এই শরম্পাতের এক ভাই এর দেড় বৎসরের জেল হয়েছিল, আমার কাছে আপানি দোয়া করি স্বপ্নে আমি সেই কোর্টে যায় এবং তার নথিপত্র বের করে নিজ হাতে তার সাজা অর্ধেক করে দেয়। পরবর্তীতে আদালত তাকে অর্ধেক সাজা দেয়।

৫৪ নং নিদর্শন : মৌলবী সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ শহীদ এর নিহত হওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, আমি সেটাও আমার রীতি মাফিক বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে লেখি, কার না জানা।

৫৫ নং নিদর্শন : মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানওয়ারী সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী যে তিনি ব্যর্থ হবে কোন এক কাজে তাই হল, তিনি নিজে সক্ষ্যি।

৫৬ নং নিদর্শন : দিল্লীতে আমার বিবাহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী যা আমি বিবাহের পূর্বেই সকলকে জানাই, সে মোতাবেক সৈয়দ বংশে আমার বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৫৭ নং দিনর্শন : মৌলবী আবু সাঈদ মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী যা বারাহীনে আহমদীয়াতে লিখিত যে তার পরিণতি বড় মন্দ হবে।

৫৮ নং নিদর্শন : দিল্লী নিবাসী মৌলবী নাজির হোসেন সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়াতে লিখিত আছে যে সে আমাকে কুফরী ফতওয়া দিবে।

৫৯ নং নিদর্শন : হুশিয়ারপুরের শেখ মেহের আলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী যে আমি স্বপ্নে দেখলাম তার ঘরে আগুন, আমি নিভিয়ে দিলাম, জানলাম, তার একটি মোকাদ্দমা ছিল তার জেল হবার কথা ছিল কিন্তু মুক্তি পেল।

৬০ নং নিদর্শন : আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী যে সেই শেখ মেহের আলী আর একটি বিপদে পরবে, পরে সে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হল।

৬১ নং নিদর্শন : আমার ভ্রাতা মরহুম গোলাম কাদেরের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।

৬২ নং নিদর্শন : তুরস্কের কনসালের ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বণী, সে মোতাবেক আল্লাহ্ পূর্ণ করে দেখালেন। আমার পুস্তকাদিতে লেখা আছে।

৬৩ নং নিদর্শন : পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়াতে আল্লাহ্ আমার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, তোমাকে হত্যা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করবো, আল্লাহ্ মির্যা সাহেবকে (আ.) সকল দুশমনি থেকে রক্ষা করেছেন।

৬৪ নং নিদর্শন : পূর্বেই আল্লাহ্ বারাহীনে আহমদীয়াতে ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করেন, তোমার বিরুদ্ধে যতগুলো মোকদ্দমা করা হবে সবগুলো থেকে তুমি মুক্তি লাভ করবে।

৬৫ নং নিদর্শন : পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বারাহীনে আহমদীয়া কিতাবে যে তোমার নিকট এত লোক আসবে যে তাদের সাক্ষাতের আধিক্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হবে।

৬৬ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়াতে বলা আছে যে, আসহাবে সুফুফা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, আমার প্রেমে পরে অনেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি নিজ জন্মভূমি ছেড়ে কাদিয়ানে বসতি স্থাপন করেছেন।

৬৭ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়াতে বলা আছে যে, তোমাকে আরবী ভাষায় দক্ষতা ও বাগ্মিতা দান করা হবে, তোমার মোকাবেলা

করার মত কেহ থাকবে না।

৬৮ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়ায় ঝগড়ার সাক্ষীর নিদর্শন, পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে।

৬৯ নং নিদর্শন : হামামাতুল বুশরা পুস্তকে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের কথা উল্লেখ আছে, আমি আমার সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ দোয়া করি ও কবুল হয়।

৭০ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়ায় উল্লেখ করেছিলাম আমাকে না মানার কারণে প্লেগে লোক সকল মারা যাবে তাই হল, সকলে সাক্ষি।

৭১ নং নিদর্শন : সিররুল খিলাফহ বইয়ে উল্লেখ করেছিলাম আমার কোন কোন বিরুদ্ধবাদী মারা যাবে।

৭২ নং নিদর্শন : অমৃতসরের বাসিন্দা মৌলবী রসূল বাবা আমার কঠোর বিরোধিতা করার কারণে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মারা যায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে।

৭৩ নং নিদর্শন : মিঃ বাটালার ডেপুটি ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ বখ্‌শ তিনিও আমার শত্রুতা করায় প্লেগে ধ্বংস হয়।

৭৪ নং নিদর্শন : জম্মুর অধিবাসী চেরাগদীন, সে আমার মোকাবেলায় রসূল হওয়ার দাবী করলো, আমাকে দাজ্জাল বললো ১৯০৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলে ২ পুত্রসহ প্লেগে ধ্বংস হয়ে নিদর্শন পুরা করলো যা সকলেই জানে।

৭৫ নং নিদর্শন : হাফেজাবাদের অধিবাসী নূর আহমদ সে বলেন, মির্যা সাহেব নিজে প্লেগে মারা যাবে আমি মারা যাব না, পরে নূর আহমদ নিজেই প্লেগে ধ্বংস হয় এবং নিদর্শন পুরা হয়।

৭৬ নং দিনর্শন : মৌলবী জয়নাল আবেদীন লাহোরের হেমায়তুল ইসলামের একজন প্রিয় শিক্ষক ছিলেন তিনি মোবাহেলা করায় কয়েকদিন পর প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তার স্ত্রীও মারা যান। তার জামাতা মারা গেলেন, তার ঘরের আরো ১৭ জন্য ব্যক্তি মারা যায় এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিদর্শন পুরা হয়।

৭৭ নং নিদর্শন : লাহোরের করীম বখ্‌শ, সে আমার চরম বিরোধিতা করায় যৌবনে মৃত্যুর শিকার হল।

৭৮ নং নিদর্শন : আফেজ সুলতান সিয়ালকোটী মির্যা সাহেবের চরম বিরোধী ছিল। ১৯০৬ সালে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করে মির্যা সাহেবকে সত্য প্রমাণিত করলেন।

৭৯ নং নিদর্শন : হাকিম মোহাম্মদ শাফি বয়আত করার পরে মুর্তাদ হয়ে আমার বিরোধিতা করতে থাকলো। তার সাথী দশজনসহ তাকে প্লেগে আল্লাহ্ ধ্বংস করলেন। তার স্ত্রী, মাতা, তার ভ্রাতা সকলে প্লেগে মারা গেল, সে যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিল তাও ধ্বংস হয়ে গেল।

৮০ নং নিদর্শন : আমার কঠোর বিরোধী মৌলবী রশিদ আহমত গাঙ্গোহী প্রথমে অন্ধ হয় পরে সর্প দংশনে মারা যায় ও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়।

৮১ নং নিদর্শন : মৌলবী শাহ দীন লুধিয়ানভী কঠোর বিরোধিতা করায় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মারা গেল।

৮২ নং নিদর্শন : আব্দুল আযিয, বিরোধিতা করায় মারা গেল, তা সকলে জানে।

৮৩ নং নিদর্শন : মোলবী মোহাম্মদ, আমার বিরোধিতা করার জন্য আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করলেন।

৮৪ নং নিদর্শন : মৌলবী আব্দুল্লাহ্ লুধিনবী আমার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করাতে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করলেন।

৮৫ নং দিনর্শন : লখুকে নিবাসী আব্দুর রহমান মহিউদ্দিন, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করায় আল্লাহ্ ধ্বংস করলেন এরা সবাই প্রথম সারির বিরুদ্ধবাদী।

৮৬নং নিদর্শন : মৌলবী গোলাম দস্তগীর কমুরী আমার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করাতে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করে দিলেন।

৮৭ নং নিদর্শন : মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন ভীওয়ালা, সেও আমার নিদর্শন অনুযায়ী মারা গেল।

৮৮ নং নিদর্শন : আমার পুস্তক নূরুল হকে আছে রমযান মাসে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হবে ও পূর্বাহ্ন (সতর্কীকরণ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্লেগ ছড়াবে, তাই হল এবং প্রায় ৩ লক্ষ লোক মারা গেল।

৮৯ নং নিদর্শন : আল্লাহ্ আমাকে জানালেন, আমি লোকের হৃদয়ে তোমার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবো। সে মোতাবেক আমার জামা'তের লোক আমার জন্য প্রাণ দিয়ে দেয়, বাড়ী ছেড়ে আমার কাছে চলে আসে, আমার জন্য আর্থিক কুরবানী করে।

৯০ নং নিদর্শন : আমার ছেলে বশির আহমদ এর প্রায় অন্ধ হয়ে যায় দাওয়া কোন কাজ করছিল না, আল্লাহ্‌র কাছে আমি দোয়া করি পরে ইলহাম হয় যে বশির সুস্থ হবে। সে মোতাবেক সুস্থ হয়ে গেল।

৯১ নং নিদর্শন : আমার গৃহের নিকট ছোট একটি মসজিদ নির্মাণ করলাম, আমার সন তারিখ জানা ছিল না, পরে খোদা আমাকে ইলহাম করে সন তারিখ অবগত করলেন।

৯২ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়ায় আমার জামাতে প্রভূত উন্নতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।

৯৩ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে আমার সম্পর্কে আল্লাহ্ জানালেন, "তোমার বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়া দেওয়া হবে, যখন আমার কোন বিরুদ্ধবাদীই ছিল না, তখনকার কথা।

৯৪ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী করালেন লোকে ইচ্ছা করবে তোমাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, তোমার উপর বিপদ-আপদ আসবে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করবেন।

৯৫ নং নিদর্শন : আমার লিখিত পুস্তকাদিতে বারংবার উল্লেখ করেছি, এ জাতির কাছ থেকে প্লেগ দুর হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন না করবে।

৯৬ নং নিদর্শন : আমি বৈঠকখানাতে উপবিষ্ট, আমার উপর বাণী এল, হামিদ আলীকে বললাম সে বললো হবে কিছু, আমি বললাম না একটু দেরি কর সব দেখবে। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়া চড়ে দুই ভ্রাতা এসে বললো আমার সঙ্গের ভ্রাতার উরুদেশে ফোড়া খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, আপনি দোয়া করুন, যাতে তার কষ্ট দূর হয়। দোয়া করলাম কষ্ট দূর হল।

৯৭ নং নিদর্শন : ১৯০৬ সালের ২৫ আগষ্ট আমার শরীর একেবারে অবশ হয়ে যায়, আমি আল্লাহর দরগাহে দোয়া করি, পরে ইলহাম হয় আমার পূর্ণ সুস্থতার পরে পূর্ণ সুস্থ হই।

৯৮ নং নিদর্শন : শূল বেদনায় অতিক্রান্ত হই এ রোগে ঐ সময় অনেক মানুষ মারাও যাচ্ছিল। আমার ব্যাপারেও তেমনি কথা বলাবলি হচ্ছিল। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলাম, পরে আল্লাহ্ ইলহাম করলেন পরে নদী হতে বালি এনে আমার শরীরে দরূদ পরে মালিশ করাতে আল্লাহ্ আমাকে মৃত্যু দার থেকে রক্ষা করে নিদর্শন দেখালেন।

৯৯ নং নিদর্শন : একবার আমার দাঁতে সাংঘাতিক ব্যাথা হল। দাঁত তুলা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। অস্থির হয়ে দোয়া করতে থাকি পরে ঘুম আসে, ঘুম থেকে জেগে দেখি ব্যাথার কোন নিশানা নাই।

(চলবে)

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(অষ্টম কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

১৯১১ সালের জুলাই মাসে চট্টগ্রাম মাদ্রাসা হাই স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর তবলীগই তাঁর স্বপ্ন সাধনা ছিল। চট্টগ্রামের বিভিন্ন আলেমদের সাথে বহাস করতে থাকেন। বড় বড় আলেমদের সাথে বহাস করতে গিয়ে তাঁর উপলব্ধি হয় তবলীগের ময়দানে সুলতানুল কলমের জ্ঞানে আরও পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। তাই কাদিয়ান চলে যাবার জন্য মনটা ব্যকুল হয়ে যায়। স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট ছুটির আবেদন করেন। তখন জানুয়ারি ১৯১৪ সাল থেকে মার্চ ১৯১৫ সাল পর্যন্ত প্রথম তিন মাস বেতনসহ ছুটি ও বাকী এক বছর বিনাবেতনের ছুটি মঞ্জুর করা হয়। অত:পর ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে সালানা জলসার পূর্বে কাদিয়ান চলে যান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং জামাতের বিশিষ্ট সাহাবী ও আলেমদের স্নেহস্পর্শ ও দোয়া লাভ করেন। জলের মাছ ডাঙ্গায় তোললে যেমন ছটফট করতে থাকে এবং পুনরায় জল পেলে প্রাণ ফিরে পায়, তেমনি কাদিয়ান পাগল মোবারক আলীর হুযূর (রা.) সহ জামাতের বুযুর্গ আলেমের সান্নিধ্য লাভে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ আরও বেশি সঞ্চারিত হয়।

তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজের ভরণপোষণের জন্য কাদিয়ানে কোন কর্ম করা এবং জামাতী তালিম তরবিয়তে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভে একজন আদর্শ তবলীগ সৈনিকে পরিণত হওয়া এবং নিজেকে জামাতের খেদমতে বিলিয়ে দেয়া। ফলে তাঁকে তালিমুল ইসলাম হাই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অপর দিকে দ্বীনি তালিম গ্রহণের জন্য ট্রেনিং ক্লাসে অংশ নেন। এই ট্রেনিং ক্লাসের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব। ছাত্রদের মধ্যে আরও ছিলেন (১) আব্দুল মুগনী খাঁ, (২) শেখ গোলাম নবী, (৩) গোলাম রসূল আফগানী এবং (৪) সৈয়দ আহমদ নূর আফগানী প্রমুখ।

তখন তিনি তালিমুল স্কুল হাই স্কুলের শিক্ষকতার দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেন এবং অপর দিকে দ্বীনি তালিম ক্লাসে একনিষ্ঠ সাধনায় জ্ঞান অর্জন করেন। সে সময় তিনি হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) (যিনি পরবর্তীতে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হিসেবে খলীফার মসনদে সমাসীন হন)-এর স্নেহভাজন হয়ে উঠে। তবলীগের উদ্দেশ্যে 'আজিমুশ্বান খোশখবর' নামে তাঁর রচিত একটি লেখার বঙ্গানুবাদের জন্য মোবারক আলীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ফলে তিনি এটা 'মহাসুসংবাদ' নামে অনুবাদ করেন। অবিভক্ত বাংলার বাংলাভাষাভাষী মানুষের নিকট এটা বহুল প্রচার করা হয়। এতে সফলতা আসে। সাহেবযাদা মির্যা সাহেব মোবারক আলী সাহেবের এ কাজে খুশি হন। ১৩ ও ১৪ মার্চ ১৯১৪ তারিখ শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া জামাতের এক ঐতিহাসিক দিন। ১৩ মার্চ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর ওফাতের পর ১৪ মার্চ দ্বিতীয় খলীফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐশী নির্দেশিত এ নির্বাচনে মোবারক আলীর উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়। তখন জামাতের বিশিষ্ট আলেম মৌলভী মোহাম্মদ আলী এম, এ, এল, এল বি (যিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী, মাসিক রিভিউ অব রিলিজিয়ন ইংরেজি ও উর্দু পত্রিকার সম্পাদক এবং পবিত্র কুরআন শরীফ অনুবাদ বোর্ডে নিয়োজিত ছিলেন) এর নেতৃত্বে শিক্ষিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি খিলাফতের প্রতি বৈরিতা করলেও বাঙালি মোবারক আলী শুরু থেকে আনুগত্য প্রকাশ করেন। নির্বাচনের পূর্বের দিন শুক্রবার সন্ধ্যায় হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ কর্তৃক আহুত সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তখন বিভিন্ন জন খলীফা নির্বাচনের পক্ষে বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন। খিলাফত প্রেমিক মোবারক আলী বলেন–'ইসলামের খলীফা Dictator নন। তিনি শরিয়তের বিধান মত চলতে বাধ্য। শরিয়ত বিরোধী কোন বিধান তিনি তৈরী করতে পারেন না। কাজেই ইসলামের প্রথম যুগে যেভাবে খলীফা নির্বাচন করা হয়েছে সেভাবেই খলীফা নির্বাচন করা প্রয়োজন'। হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) পর দিন জামাতের সকলকে নফল রোযা রাখার এবং অধিক দোয়া করার তাহরিক করেন। ফলে অধিকাংশ খোদা প্রেমিক এতে সাড়া দেন।

পরদিন শনিবার আসর নামাযের পর মসজিদ নূরের প্রাঙ্গনে খলীফা নির্বাচনের জন্য সকলে সমবেত হন। হযরত মওলানা মোহাম্মদ আহসান সাহেব আমরোহী (রা.)

বলেন–আমি সাহেবজাদা মিঞা মাহমুদ আহমদ সাহেবকে খলীফা হিসেবে মান্য করি। এ বলে তিনি হযরত মিঞা সাহেবের দিকে বয়আত করার জন্য হাত বাড়ান। ৮/১০ হাত দূরে মৌলভী মোহাম্মদ আলী কিছু বলার জন্য দাঁড়ালে কেউ তার দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। উপস্থিত মাত্র ক'জন ছাড়া বাকী সবাই বয়আত করার জন্য হাত বাড়ান। ফলে হযরত মিঞা সাহেবের হাতে বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন হয়। এতে মোবারক আলী সাহেবেরও বয়আত করার সৌভাগ্য হয়। ঐশী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ফেরেশ্‌তা বাহিনী দ্বারা কুদরতে সানীয়ার দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচন করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত মহান পুত্র হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কর্মময় জীবনালখ্যের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার প্রবাহ আরো বৃদ্ধি পায়। শিক্ষিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তির বিরোধিতায় মোবারক আলী সাহেবের মত খিলাফত প্রেমিকদের মাঝে পূর্ব থেকে হযরত মিঞা মাহমুদ আহমদ সাহেবকে খলীফা নির্বাচনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল। যা আল্লাহ্ তাআলা বাস্তবায়ন করেন। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে এটা একটি ঐতিহাসিক মাইল ফলকের ঘটনা। মোবারক আলী সাহেবের জীবনের এক স্মর্ণালী অধ্যায়।

নতুন খলীফা নির্বাচনের কিছু দিন পর মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব এক দিন রাতে লাহোর চলে যান। তার অনুগমনকারী ডাঃ মির্যা ইয়াকুব বেগ, ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন শাহ, শেখ রহমতুল্লাহ, খাজা কামাল উদ্দিনসহ আরো ক'জনকে নিয়ে লাহোরে আহমদীয়া লাহোরী আন্দোলন গড়ে তোলেন।

তখন মোবারক আলী সাহেব কাদিয়ান থেকে বগুড়ায় পিতা আরজউদ্দিন আহমদের নিকট কাদিয়ান আসার অনুরোধ করে পত্র লিখেন। উদ্দেশ্য পিতা কাদিয়ানের পবিত্র ভূমির সান্নিধ্য লাভে যুগ ইমামের সত্যতা উপলব্ধি করে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্যবান হোক। ফলে পিতা পত্র পাওয়া মাত্র তার ছোট ছেলে বেলায়েত আলীসহ কাদিয়ান চলে যান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং জামাতের বিশিষ্ট সাহাবী ও আলেমদের সংস্পর্শে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতা যাচাই করে অল্প দিনের মধ্যে পিতা-পুত্র বয়আত করেন। তখন বেলায়েত আলীকে কাদিয়ানের শিক্ষায় মানুষ হওয়ার আশায় তালিমুল ইসলাম হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়া হয়। কিছু দিন পর রমযানের শেষ দিকে ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষ্যে পিতা ও ছোট ভাইয়ের সাথে তিনি বগুড়ায় চলে আসেন।

কিন্তু কাদিয়ান পাগল মোবারক আলীর মনটা পরে থাকে কাদিয়ানের দারুল আমান-শান্তিনিকেতনে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায়। তাই ঈদের পর পর তিনি পুনরায় কাদিয়ান চলে যান। জামাতের বিভিন্ন মুখী কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তখন বঙ্গদেশে তবলীগের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর অনুমতিক্রমে হযরত হাফেজ রৌশন আলী (রা.)-কে নিয়ে আসেন। তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে তবলীগ করার পর ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে জলসার ক'দিন পূর্বে জেরে তবলীগ বন্ধু খান বাহাদুর আবুল হাসেম খানসহ কাদিয়ান চলে যান। জলসার পর ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে খান বাহাদুর সাহেব বয়াত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন।

তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মোবারক আলী সাহেবকে ইংরেজি অনুবাদ বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন এবং হুযূর (রা.) এ বোর্ডের প্রধান ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মোবারক আলী সাহেব বলেন– 'জানুয়ারি ১৯১৫ থেকে মার্চ ১৯১৫ পর্যন্ত আমার কাজ ছিল কুরআন মজীদের প্রথম সিপারার তর্জমার পান্ডুলিপি প্রস্তুত করা। হুযূর নিজে প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকতেন। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা হলেন (১) হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.) এম এ, (২) মৌলভী মোহাম্মদ দীন (রা.) বি এ বি টি প্রধান শিক্ষক টি আই হাই স্কুল, (৩) মৌলভী আব্দুল হক সহকারী শিক্ষক টি আই হাই স্কুল, (৪) মৌলভী আব্দুর রহমান টি আই হাই স্কুলের সরকারী শিক্ষক, (৫) হযরত মৌলভী শের আলী (রা.), (৬) মৌলভী আব্দুল মুগনী খাঁ এবং (৭) মৌলভী আব্দুল গনি টি আই হাই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক প্রমুখ। আমি ছিলাম এ বোর্ডের সেক্রেটারী। কুরআন শরীফের তর্জমা আরবী থেকে ইংরেজিতে খসড়া প্রস্তুত করার দায়িত্ব আমার উপর ছিল। আমি যে সমস্ত খসড়া প্রস্তুত করতাম পরদিন বোর্ডে তা আলোচনা হতো এবং আবশ্যকীয় পরিবর্তন করার পর খসড়া চূড়ান্ত হতো। এ কাজের জন্য ঐ সময় যতগুলি ইংরেজি তর্জমা বিদ্যমান ছিল সবগুলিই আমাকে দেওয়া হয় এবং Lanes Arabic English Dictionary 6 Volume এবং Encyclopedia Britanica সম্পূর্ণ ২৬ বা ২৭ খন্ড Jewish Encyclopedia কয়েক খন্ড কুরআন ও ইসলাম সংক্রান্ত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থাদি হতে সহায়তা নেয়ার জন্য আমাকে দেওয়া হয়েছিল। এই কাজটি আমার খুব ভাল লাগে। এতে কুরআন শরীফের খেদমত ও জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাই'। (পাক্ষিক আহমদী ৩০ জুন ১৯৬৫)।

ফলে মোবারক আলী সাহেবের হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রা.) এবং জামাতের পান্ডিত্যের অধিকারী আলেমদের সাথে পবিত্র কুরআন মজীদের তরজমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়। তিনি পবিত্র চিত্তে একনিষ্ঠ সাধনায় কুরআন তরজমা বোর্ডে নিরলস কাজ করেন। এরই মধ্যে ৩১ মার্চ ১৯১৫ তারিখ তাঁর চাকুরির ছুটির মেয়াদ ঘনিয়ে আসলে কাদিয়ান ছেড়ে চলে না যেতে তাঁর মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে যায়। হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। তাই বিনা বেতনের ছুটির মেয়াদ আরও বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। তখন চট্টগ্রাম মাদ্রাসা হাই স্কুলের সুপারিন্টেডেন্ট সামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন সাহেব উত্তরে জানান–আপনাকে আর ছুটি দেওয়া যাবে না। হয় কাজে যোগদান করুন, নতুবা চাকুরি থেকে ইস্তফা দিন। আপনি আসলে মাদ্রাসা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রথমে অস্থায়ী পরে স্থায়ী পদোন্নতি দেয়া হবে। মাসিক বেতন একশত এবং ডিউটি এ্যালাউন্স পঞ্চাশ টাকা পাবেন। কিন্তু পার্থিব জীবনের প্রথিতযশা প্রধান শিক্ষক পদের পদোন্নতি তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা– বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতিত কিছুই নয় (আলে ইমরান ঃ ১৮৬)। তোমরা কি পরকালের মোকাবেলায় পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গিয়েছ? কিন্তু পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য (আততাওবা : ৩৮)।

(চলবে)

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শেখায়"**। পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শেখায়

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। আর এই ইসলামের মূল সংবিধান হচ্ছে আল কুরআন। মহান আল্লাহ্ কুরআন করীমের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান প্রদান করেছেন। আসমানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে কুরআন অন্য সব গ্রন্থ থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কুরআন শরীফ মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর নাযিল করেন। আর এই কুরআন নাযিলের মাধ্যমেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়।

কুরআন করীম দীর্ঘ ২৩ বৎসরে নাযিল হয়। যা পরবর্তীতে বিভিন্ন মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। কুরআনের ভাষা সহজ ও সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "নিশ্চয় আমি এ কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে" (সূরা আদ দুখান : ৫৮)। নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির কর্তব্য। আর ফজরের নামাযের পর কুরআন তেলাওয়াত করার উত্তম সময়। আমরা যারা কুরআন পড়তে জানি, আমাদের উচিত অন্যকে শেখানো। নিজে পড়া ও অন্যকে শিক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হাদীস–খায়রুকুম মানতা আল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু। অর্থ তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নিজে কুরআন শিখেও অন্যকে শেখায়। হাদীস থেকে বুঝা যায় যে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমাদের সকলের উচিত কুরআন বুঝে, সঠিক অর্থ জেনে তেলাওয়াত করা। আর তার প্রতি সঠিক আমল করা। আর কুরআনের আমল করার মাধ্যমেই মানবতার দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি পাওয়া সম্ভব। অতএব কুরআন তেলাওয়াত ও এর প্রতি আমল করার মাধ্যমে আমরা যেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এর আনুগত্য লাভ করতে পারি, আমীন।

শেখ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আমাদের সবাইকে কুরআনী আলোয় আলোকিত হতে হবে

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এ সেই পূর্ণাঙ্গ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা বাকারা : ৩) এই কিতাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বয়ং খোদা তাআলা এই কিতাবের প্রথমেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে রেখেছেন। পূর্বে অনেক কিতাবই বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণ বহন করেছেন কিন্তু সেগুলো সবাই ছিল অপূর্ণাঙ্গ। অতএব, আল্লাহ্ তাআলা সিদ্ধান্ত নিলেন শ্রেষ্ঠ রাসূল ও পবিত্র আত্মা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকটেই এ মর্যাদাপূর্ণ অমূল্য ভান্ডার দান করবেন।

এই কিতাবের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু মুসলমানগণই জেনে থাকবেন না বরং অন্যান্য অমুসলিম বিশেষ করে বিজ্ঞানীগণ, এই কিতাবের নিদারুন গুপ্ত রহস্য ও তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্বকে বিস্মায়িত করছে। এখন কথা হচ্ছে, কুরআন শরীফই একমাত্র শ্রেষ্ঠ কিতাব যার কারণে পরম যত্ন করে এটাকে শিখে নেয়া সকলের আবশ্যক কর্তব্য। অন্যান্য সকল জাগতিক জ্ঞান অর্জনের পূর্বে যদি কেউ কুরআন পাঠ করে তখন সে দেখবে তার এই জাগতিক জ্ঞান কুরআনের অংশ। কুরআন শেখা ও প্রতিদিনের পাঠের মাধ্যমে এর আদেশ-নিষেধ অবগত হয়ে এর শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোই মূল কাজ।

কুরআন পাঠকারীদের হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনেক জ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করতেন। এর সম্মুখে প্রমাণ হচ্ছে–কাফেরদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন যে সত্তর জন কুরআনে হাফেজ শহীদ হয়েছিল তার উত্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যে উদগ্রীবতা ছিল দেখে আমরা বুঝতে পারি। অপরদিকে বর্তমানে অবক্ষয়ের এই যুগে আহমদী ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত কুরআন পাঠ করে এর শিক্ষা বুঝে নিয়ে বর্তমান সমাজকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করতে হবে।

নিজেদের কুরআন পাঠের পাশাপাশি নিজ পরিবার ও অন্যান্য নিকটতমদের কুরআন শেখাতে হবে। যাতে করে এই পবিত্র কিতাবের পাঠকারী বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার ঘটে। কুরআনের প্রতিটি অক্ষর পাঠ করার জন্য আলাদা আলাদা নেকীর গণনা রয়েছে। আর কুরআনের শিক্ষকদের মর্যাদা অন্যান্য সকল জাগতিক শিক্ষকদের উর্ধ্বে। তাই ছোট-বড় সকলে নির্বিশেষে নিজেরা কুরআন শিখতে হবে ও অন্যান্যদের শেখাতে হবে।

এই সম্বন্ধে যুগ খলীফাগণ তাজা খুতবা দিয়ে থাকেন, তাদের বাণীগুলো মনে রেখে কুরআনী আলোয় আলোকিত হতে হবে। অন্ধকারাচ্ছাদিত এই সময়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও যে এই কুরআনের উত্তোলোতাকে ফিরিয়ে আনতে এসেছেন ; এজন্যেই আমাদের তথা আহমদীর সকল সদস্যদের এক একজনকে কুরআনের শিক্ষক হতে হবে। আহমদীয়াতের প্রসার যত ঘটবে কুরআনী আলোর তত দরকার হবে এই জন্য চাই শিক্ষক।

তাই আসুন অবাধ্যতার, নৈরাজ্যতার, অশ্লীলতার, হত্যার অধ্যায় শেষ করতে কুরআনের পাঠক নিজে হই, অন্যকে পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করি এবং মূল কাজটি হল এর শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করি, আল্লাহ্ তাআলা তা-ই করুন, আমীন।

মুয়াযযেম আহমদ সানী, উথলী

কুরআনের মহিমা সকল মহিমার উর্ধ্বে

শরীয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদ। এর উপরই শরীয়তের মূল কাঠামো দন্ডায়মান। মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ আসামানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থই "কুরআন মজীদ"। লাওহে মাহ্‌ফুজ

থেকে কদর রাতে পৃথিবীর নিকটতম আসমান 'বায়তুল ইয়াযহ্‌' নামক স্থানে সম্পূর্ণ কুরআন এক সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর নাযিল হয়। কুরআনের যে অংশ যখন নাযিল হত নবী করীম (সা.) সাথে সাথে তা কণ্ঠস্থ করতেন। এমননি ওহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে তাঁর দুই ঠোঁট নেড়ে মুখস্ত করার চেষ্টা করতেন। তিনি রাতদিন কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন।

সাহাবীগণকেও মুখস্ত করার নির্দেশ দিতেন। সাহাবীরা নিজেরা কুরআন হিফয করতেন, নিজেদের পরিবার পরিজনকেও যত্নসহকারে মুখস্ত করাতেন। গভীর রাতে তাদের ঘর থেকে তিলাওয়াতের গুণ গুণ রব উত্থিত হত। মহানবী (সা.) রাতের অন্ধকারে তাদের গৃহপার্শ্বে গিয়ে তাদের তিলাওয়াত শ্রবণ করতেন। কুরআন মজীদ মনোযোগ সহকারে পড়ার ব্যাপারে মহানবী (সা.) বলেন, "সে আমাদের দলে নয়, যে সুর করে কুরআন পড়ে না।"(বুখারী) কুরআন পাঠের ফযিলত সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, "কুরআন পাঠ কর, কেননা বিচার দিবসে এটি পাঠকের শাফায়াতকারী হবে" (মুসলিম)।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য সাহাবীদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরণ করতেন। হিজরতের পূর্বে তিনি মুসআব ইবনে উমাইয়ার (রা.) এবং আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উম্মে মাফতূম (রা.)কে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মদীনায় প্রেরণ করেন। তিনি (সা.) নি:স্বার্থভাবে কুরআনের শিক্ষা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, তুমি বল, "আমি তোমাদের নিকট (সত্য প্রচারের বিনিময়ে) যা কিছু পরিশ্রমিক চেয়ে থাকি, তা তোমাদেরই জন্যে। আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আছে, বস্তুত তিনিই প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক। (৩৪ : ৪৮)

কুরআনের মহিমা সকল মহিমার উর্ধ্বে। সর্ব প্রকারের মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে। আল্লাহ্‌ তাআলা করুন, আমরা যেন প্রত্যহ মনোযোগ সহকারে কুরআন পাঠ করতে পারি এবং প্রণয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন করে শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে অন্যকে কুরআন শিক্ষা দিতে পারি। মহান আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সকলের সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

ইসমত আরা (উর্মি), চট্টগ্রাম

কুরআনকে যারা সম্মান দান করবে, আকাশে তারা সম্মান লাভ করবে

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, ইসলামে কুরআন করীম শিক্ষার গুরুত্ব কত ব্যাপক। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তম হতে পারি না যতক্ষণ না পবিত্র কুরআন নিজে শিখবো এবং অন্যকে শেখাবো। মহান খোদা তাআলার বিশেষ কৃপা যে তিনি আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনের মত মহা ঐশী গ্রন্থ সর্ব শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। তাই আমরা সৌভাগ্যবান, আমাদের কাছে এমন এক ঐশী গ্রন্থ রয়েছে যার হেফাজতের দায়ীত্বও সয়ং খোদা তাআলা নিজে গ্রহণ করেছেন।

আমাদের সবার উচিৎ এই মহা গ্রন্থ পাঠ করে তার আদেশ-নিশেধের অনসরণ করে নিজেদের জীবন পরিচালিত করা। ার প্রতি আমল করতে হবে। যেভাবে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১১ জুমুআর খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেক ঘরে যেন প্রত্যেহ কুরআন তেলোওয়াত করা হয় এবং অর্থসহ যেন পাঠ করা হয় আর এর শিক্ষার উপর আমল করে আমরা যেন জীবন পরিচালিত করি। আমাদের সবার এখন মূল দায়ীত্ব হল যুগ খলীফার আহবানে লাব্বায়েক বলা। আমরা যদি এমনটি প্রত্যহ করি তাহলে আমাদের পরিবারেও শান্তি বিরাজ করবে আর আমরা সবাই খোদার নৈকট্য লাভের অধিকারী হব।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেন, তোমরা বিশেষ মনোনিবেশের সাথে কুরআন শরীফ পাঠ কর এবং এর সাথে প্রগাঢ় ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এমনই গভীর ভালবাসা যা অন্য কারও সাথে তোমরা কর নাই। কুরআন শরীফ সার্বিক সফলতা ও মুক্তির উৎস। ধর্ম-সম্বন্ধীয় তোমাদের এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নেই, কুরআন শরীফে যা পাওয়া যায় না। কিয়ামত দিবসে কুরআন শরীফই হবে তোমাদের ঈমোনের সত্যাসত্যের মানদন্ড। কুরআন শরীফ ছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, কুরআন শরীফের সাহায্য না নিয়ে যা তোমাদের 'হেদায়াত' দান করতে পারে। (কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃষ্ঠা-২৬)

মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করুন এবং এর শিক্ষার উপর আমরা সবাই যেন আমলকারী হই, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী
তেজগাঁও, ঢাক

কুরআন পড়া ও শেখানো উত্তম কাজ

সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তা জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, **"ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাকা"**। অর্থাৎ পড় তোমার প্রভুপ্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আলাক) আল্লাহ্‌র রাসূল পড়তে জানতেন না আল্লাহ্‌ তাঁর এই প্রিয় বান্দাকে ফিরিশ্‌তা দ্বারা পড়া শিখালেন। দীর্ঘ ২৩ বছরে এই পাক কালাম কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) এর উপরে।

রাসূল করীম (সা.)-এর বাণী থেকে আমরা কুরআন পড়া ও শেখা উত্তম কাজ হিসেবে জানি। আমাদের মধ্যে যারা কুরআন পড়া এখানো পারেন না তাদের উচিত হবে বিনা ব্যতিক্রমে কুরআন শরীফ পড়তে শেখা। শুধু যে শিশুরা কুরআন পড়া শিখবে এমন নয় বরং বড়দের মধ্যেও যারা এখনও গাফলতির কারণে কুরআন পড়া শিখতে পারেনি তাদের উচিত হবে নিজ আত্মীয় হোক আর ভ্রাতা ভগ্নি, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-কন্যা, স্বামী-সন্তান যেই হোক না কেন তার কাছ থেকে কুরআন পড়া শিখে নেওয়া।

আমাদেরকে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) পাক কুরআনকে গভীর ভালবাসা দিয়ে পড়তে বলেছেন। তিনি (আ.) বলেন,–তোমরা বিশেষ মনোনিবেশের সাথে কুরআন শরীফ পাঠ কর এবং এর সাথে প্রগাঢ় ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর, এমনই গভীর ভালোবাসা যা অন্য কারও সাথে তোমরা করনি।

আমাদের প্রাণ প্রিয় হুযূর (আই.) কুরআন পড়া সম্পর্কে আমাদের তাগীদ দিয়ে বলেছেন, "ছেলে মেয়েদের মাঝে কুরআন করীম পাঠের অভ্যাস গড়ুন এবং নিজেও পড়ুন। প্রতিটি গৃহ থেকে তেলাওয়াতের ধ্বনি আসতে থাকা উচিত।"–হুযূরের ইচ্ছা কুরআন শিখে আমরা যেন নিয়মিত পড়তে থাকি ও পড়াতে থাকি। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের হুযূর (আই.)-এর আশা পূরণ করার তৌফিক দিন। (আমীন)

শবনাম নাজ দৃষ্টি, ঘাটুরা

সং বা দ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বিষ্ণুপুর-এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৯ ডিসেম্বর ২০১১ইং শুক্রবার হুযূর আনোয়ার (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত সরাসরি খুতবা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় সেই সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষ্ণুপুর এর উদ্যোগে বাদ মাগরিব সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ শাহজাহান ভূইয়া, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বিষ্ণুপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোশারফ হোসেন, সেক্রেটারী তালিম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নযম পরিবেশনের পর মহানবী (সা.) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন, নূর মোহাম্মদ ভূইয়া, সাবেক কায়েদ, শফিকুল আলম বাবু, যয়ীম, আমীর মাহমুদ ভুইয়া, জেনারেল সক্রেটারী। মৌ. আব্দুল হাকিম, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ এবং বিশেষ অতিথি মোশারফ হোসেন, সেক্রেটারী তালিম। এতে ৫ জন মেহমানসহ মোট ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন। ১ জন বয়আত করেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্তি ঘটে।

মৌ. আব্দুল হাকিম

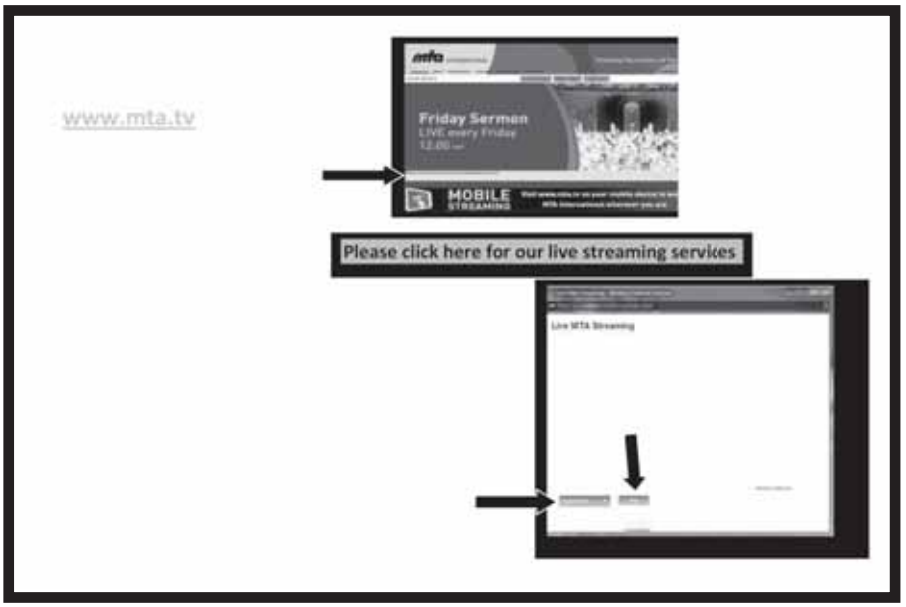

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ব্রত:

"ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে"

"Love for all
Hatred for none"

শোক সংবাদ

* অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, জনাব আলতাপ হোসেন যিনি মরহুম আব্বাস আলী মোক্তার এর পুত্র বার্ধক্যজনিত কারণে গত ২১/১১/২০১১ইং তারিখে ঢাকার এক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাই রাজিউন) মরহুম একজন জন্মগত আহমদী ছিলেন। তিনি নয়মিত চাঁদা পরিশোধকারী সদস্য ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর কোন বকেয়া ছিল না। তিনি সেক্রেটারী তবলীগ, ফাইনান্স, জায়েদাদসহ জামাতের অন্যান্য সেবা করেছেন, মরহুম একজন মুসীও ছিলেন। তাঁর ওসীয়্যত নম্বর-৯০৮৮৬। গত ২৫/১১/২০১১ইং তারিখে মসজিদে জুমুআর নামাযের পর মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বগুড়া

* আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চাঁনতারার মরহুম নয়েন উদ্দিন আকন্দ সাহেবের বিবি সমলা বেওয়া গত ২৩/১২/১১ইং শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে টাংগাইলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৩ ছেলে ৩ মেয়ে ও অনেক নাতী-নাতনী রেখে যান। তার ছোট দুই ছেলে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত। চাঁনতারা মসজিদ মাঠে মরহুমার জানাযা পড়ানো হয় এবং এতে ২৫/৩০ জন নন আহমদী অংশগ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাআলা মরহুমার পরিবারকে সাব্‌রে জামীল দান করুন।

মৌ. মোহাম্মদ আমীর হোসেন

ক্রোড়পত্র

মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ ঃ ৩৪তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা ও মজলিসে শূরা-২০১১ উপলক্ষে হুযুর (আইঃ) প্রদত্ত অমূল্য বাণী

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
وعلی عبدہ المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھو الناصر

২০ ডিসেম্বর, ২০১১

বাংলাদেশের প্রিয় আনসার ভাইগণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে বার্ষিক জাতীয় ইজতেমায় আপনারা সমবেত হয়ে বাংলাদেশের সকল প্রান্ত থেকে নবাগত এবং প্রবীণ সদস্যগণ পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করছেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো জামাতের নেতৃস্থানীয় ধর্মপরায়ন ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য শ্রবণ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করা ও তা বৃদ্ধি করা। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত সদস্যগণ সমস্ত ইবাদত বন্দেগী নামায জমাতবদ্ধ হয়ে এখানে আদায় করার সুযোগ পাবেন।

আপনাদের সদর সাহেব আনসার সদস্যদের জন্য বিশেষ একটি বাণী প্রেরণের আবেদন জানিয়েছেন। এটা আমাকে মানব জাতিকে ধ্বংস ও বিলোপ সাধন থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ দোয়া করতে অনুরোধ জানানোর সুযোগ এনে দিয়েছে। সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা ও ভয়াবহতা নিশ্চয়ই আপনারা প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, যা কেবলই বেড়ে চলেছে। আর সেই সাথে মানুষ মানুষে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবির নির্মম নৃশংসতাও চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। এ সবই সেই সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে যে, মানব জাতি দ্রুতলয়ে আল্লাহ তায়ালার আশিষ-বঞ্চিত হয়ে চলেছে। কারণ তার বিধিবিধান ও নির্দেশনা আমরা মানছি না। আল্লাহ্‌তাআলা এইসব সর্বনাশা বিপর্যয় থেকে উদ্ধার ও মুক্তির পথ-নির্দেশ দান করেছেন তাঁর অবতীর্ণ সর্বশেষ কিতাব পবিত্র কুরআন মজীদে। পবিত্র কুরআনের বিধিবিধান ও নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হলে শান্তি ও স্বস্তিপূর্ণ এক সমাজ প্রতিষ্ঠালাভ করতো। তবে পবিত্র এই কিতাবের বিষয়বস্তু হয় অধিকাংশ লোকেরা জানে না নয়তো বুঝে না কিংবা তা তাদের বোধশক্তির নাগালের বাইরে।

হযরত মসীহ্ মাউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর এই যুগে প্রকৃত ইসলাম উপস্থাপন করা এবং কুরআনে বর্ণিত নীতিমালা শিক্ষাদান করার মহান দায়িত্ব আহ্‌মদী মুসলমানদের উপর ন্যস্ত।

আহ্‌মদী মুসলমানদের মধ্যে আবার চল্লিশ ও তদুর্ধ বয়সের পরিপক্ক পুরুষ সদস্যদের দ্বারা গঠিত সংগঠন মজলিস আনসারুল্লাহকে পবিত্র কুরআন শেখা ও অন্যদেরকে শেখানোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে এখানে সমবেত আনসার সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমার বিশেষ বার্তা– প্রথমতঃ নিজেরা পবিত্র কুরআন শিখুন, পরে অন্য আনসারদেরকে শেখান। অতঃপর নিজেদের ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্যদেরকেও শেখান, আমাদের জামাতের বাইরে যারা রয়েছেন, তাদেরকেও শেখান। এটা করতে পারলে, ইনশাআল্লাহ আমরা লোকদেরকে সেই হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবো, যা শান্তিময় ও স্বস্তিদায়ক পথ।

সবশেষে দোয়া করছি আল্লাহ এই ইজতেমা সবদিক থেকে কল্যাণমন্ডিত করুন। আমি আশা করি আধ্যাত্মিক এই সম্মেলন থেকে এর অংশগ্রহণকারী ও সংগঠকগণ শিক্ষালাভ করে উপকৃত হবেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ও সাহায্যকারীদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করুন।

ওয়াস্‌সালাম।

(মির্যা মাসরূর আহমদ)
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহ্‌মাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার সরাসরি বাংলা সম্প্রচার সহ MTA দেখুন ইন্টারনেটেঃ
http://www.mta.tv
অনুষ্ঠান বিষয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শ পাঠানঃ আহমদ তবশির চৌধুরী, ইনচার্জ, এম টি এ, বাংলাদেশ স্টুডিও।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। Email: atabshir@hotmail.com

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- **জনতা সেনেটারী**
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

COMPLETE VIEW OF ADVANCED INDOOR OUTDOOR SIGNAGE & POP SYSTEMS

BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A,Chittagong
Tel: 683555

HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com

SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

New Vol. No. 74 | 12th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

31 December, 2011 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com